KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. KLMLGK 200	Place of Publication ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection KLMLGK	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol & Number ১২/- ১৫/- ১৯/- 20/- 20/-	Year of Publication ভাদ্র ১৩৭১ ‖ Sep 1964 জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ ‖ June 1968 কার্তিক ১৩৭৮ ‖ Nov 1971 আষাঢ় ১৩৭৯ ‖ July 1972 অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ ‖ Dec 1972
	Condition Brittle Good ✓
Editor আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দ্বাদশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৭১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

ডঃ হরিহর মিশ্র ॥ **কান্তা ও কাব্য** ৫·০০ রণেন্দ্রনাথ দেব ॥ **কবি স্বরূপের সংজ্ঞা** ৪·০০০

॥ বৈষ্ণব সাহিত্য ॥

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ **চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি** ১২·৫০ ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি ॥ **চৈতন্য পরিকর** ১৬·০০

॥ রবীন্দ্র সাহিত্য ॥

বিমানবিহারী মজুমদার
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬·০০

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় ১০·০০

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য ১০·০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ৫·০০

ধীরানন্দ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা ১২·০০
রাবীন্দ্রিকী ৪·৫০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ ৪·০০
রবীন্দ্র অভিধান ১ম, ২য়, ৩য় প্রতি খণ্ড ৬·০০

॥ মনোরম সমালোচনা ॥

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণুপুর ঘরানা ৫·০০

মোহিতলাল মজুমদার
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১০·০০

শিশির দাশ
মধুসূদনের কবি মানস ২·০০

অহীন্দ্র চৌধুরী
বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরীশচন্দ্র ৫·০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
বিদেশী ভারত সাধক ৩·৫০

ধীরানন্দ ঠাকুর
বাংলা উচ্চারণ কোষ ৩·০০

ডঃ অসিতকুমার হালদার
রূপদর্শিকা ১·০০

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি ৫·২৫

গোপালদাস চৌধুরী
প্রিয়রঞ্জন সেন
প্রবাদ বচন ৬·০০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

নিয়মাবলী

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখ)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

দ্বাদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৫ ভাদ্র তেরশ' একাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২২৯

বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন চিন্তা ও বাঙালী সমাজ-মন ॥ অলোক রায় ২৩৫

বিহারীলালের কাব্যের পুনর্বিচার ॥ নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৪০

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা ॥ অমিয়কুমার মজুমদার ২৪৯

ঘেঁটু ঠাকুর ও ঘেঁটু গান ॥ নারায়ণ দত্ত ২৫৭

শিল্পে আবেগ ॥ দেবব্রত চক্রবর্তী ২৬১

ছোট গল্প অধ্যয়নের গোড়ার কথা ॥ গীতা পাল ২৬২

সমালোচনা : রূপদর্শিকা ॥ চণ্ডী লাহিড়ী ২৬৪
এই অন্ধকার-আলো ॥ রেবন্ত চট্টোপাধ্যায় ২৬৫
প্রথম ভালোবাসা ॥ সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৭

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ভাদ্র
তের'শ একাত্তর

সমকালীন

দ্বাদশ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দ কুমারস্বামী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট সিংহল দেশের কলম্বো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দের পিতা সার মুথু কুমারস্বামী কলম্বোর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যাইয়া ভারতীয় বংশোদ্ভবদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল হইবার গৌরব অর্জন করেন। সার মুথু সিংহলের বিধান সভার একজন সদস্যও ছিলেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম 'নাইট্' উপাধি প্রাপ্ত হন। সার মুথু দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষী 'মুদালিয়র' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এই পরিবার দীর্ঘকাল যাবৎ সিংহলেই বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং কয়েকটি পালি বৌদ্ধগ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতিকালে সার মুথু এলিজাবেথ ক্লে বিবি নাম্নী এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি সাতিশয় সংস্কৃতিসম্পন্না ও শিল্পরসজ্ঞা ছিলেন। এই ইংরাজ খৃষ্টান মহিলার গর্ভেই আনন্দ কুমারস্বামীর জন্ম হয়।

আনন্দের জন্মের অল্প কিছুকাল পরেই তাঁহার গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। হৃত স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত শিশু আনন্দকে লইয়া তাঁহার মাতা ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে কিছুদিন পর সার মুথুও ইংল্যাণ্ডে গিয়া পত্নী-পুত্রের সহিত মিলিত হইবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মাতার সহিত আনন্দের ইংল্যাণ্ড যাত্রার কিছুকাল পরই সার মুথু সিংহলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর আনন্দের বিদুষী জননী স্বয়ং আনন্দের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডের Gloucestershire অঞ্চলের Stonehouse নামক পল্লীর Wycliffe কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া আনন্দ লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব

লাভ করেন। পরে ভূতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টর অফ্ সায়েন্স" ডিগ্রী অর্জন করেন। যৌবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ কুমারস্বামী নানা বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লেখা আরম্ভ করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সিংহল গভর্ণমেণ্টের অধীনে ধাতু সমীক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের পদলাভ করিয়া (Director, Mineralogical Survey) আনন্দ কুমারস্বামী সিংহলে প্রত্যাবর্তন করেন। তিন বৎসর কাল অতি যোগ্যতার সহিত তাঁহার ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেন। সরকারী কার্য উপলক্ষ্যে সিংহলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে আনন্দ সিংহলের ধ্বংসপ্রায় শিল্প নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া যান। এই শিল্প নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং এই ভাবেই তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসীই মূলতঃ ভারতের সন্তান, আনন্দ কুমারস্বামী সিংহলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পিতৃপুরুষও ছিলেন ভারতবাসী। সিংহল ও ভারতের সভ্যতার উত্তরাধিকারী বোধে তিনি এই সময় হইতেই গর্বিত বোধ করিতে থাকেন। কুমারস্বামী সিংহলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যে শিক্ষিত সিংহলীগণ তাঁহাদের ঐতিহ্য ভুলিয়া প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণেই তাঁহাদের জীবন ব্যয়িত করিতেছেন। সিংহলের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ফিরাইয়া আনার জন্য আনন্দ Ceylon Reform Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন এবং নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। জাতীয় ভাবধারার প্রচার, জাতীয়ভাষার উন্নতি ও তদ্বারা শিক্ষাবিস্তার এই সমিতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই সমিতি ও সমিতির সভাপতি কুমারস্বামীর অক্লান্ত চেষ্টায় সিংহলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহলের সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আনন্দকুমার স্বামী প্রথমে পিতৃভূমি ভারতে আসিয়া ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ও ভারত সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এই বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন (ভারতের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়া তিনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও সমাদরভাজন হন। ইহার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়া কিছুকাল তথায় বাস করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ভারতচর্চার জন্য "ইণ্ডিয়া সোসাইটি" প্রধানতঃ কুমার স্বামীর চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে কুমারস্বামী পুনরায় ভারতে আসেন এবং দীর্ঘকাল এই দেশে অবস্থিতি করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সহিত কুমারস্বামীর বিশেষ পরিচয় স্থাপিত হয় এবং দীর্ঘকাল তিনি ঠাকুর পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিতও কুমারস্বামীর বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মে। উভয়ের এই সৌহার্দ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। কবিগুরুর আমন্ত্রণে কুমারস্বামী কিছুকাল শান্তিনিকেতনেও অবস্থান করেন। কুমারস্বামীর ভারতবাসকালে বাঙ্গালাদেশে শ্রীঅরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র পাল-সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। ভারতীয় সভ্যতার একান্ত অনুরাগী কুমারস্বামী স্বভাবতঃই এই আন্দোলনের অন্যতম ধারক ও প্রবক্তারূপে পরিগণিত হন। এই সময়ে তাঁহার বক্তৃতাদি ও রচনাবলীতে ভারতীয় আন্দোলন পরিপুষ্টি লাভ করে। এই সময়ে তিনি জাতীয়শিক্ষা

ও জাতীয় ঐতিহ্য চেতনা সঞ্চারের জন্য নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, Y. M. C. A., ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টেল আর্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বহু ভাষণ দান করেন। এই সময়ে তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু শিল্পনিদর্শন সংগ্রহ করেন। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে একটি বিরাট প্রদর্শনী হয়, কুমারস্বামী এই প্রদর্শনীর কলা শাখাটি সংগঠন করেন। কুমারস্বামী জন্মসূত্রে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী হইলেও ভারতবাসকালে তিনি হিন্দুধর্মের প্রবল অনুরাগী হইয়া পড়েন। কথিত আছে যে ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কোন বৈষ্ণব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশ প্রদর্শনী পর কুমারস্বামীর অভিপ্রায় ছিল যে তাঁহার সংগৃহীত শিল্পবস্তুগুলি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য একটি স্থায়ী সংগ্রহালয় স্থাপিত হউক। এই উদ্দেশ্যে তিনি অর্থ সংগ্রহেরও চেষ্টা করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল না হওয়াতে এইগুলি তিনি Denman W. Ross নামে আমেরিকান যুক্ত রাষ্ট্রের Boston Museum of Fine Arts এর একজন ফ্রাস-রক্ষককে (Trustee) অর্পণ করেন। Denman Ross অমূল্য সম্পদগুলি বোষ্টন মিউজিয়ামকে দান করেন। ১৯০৭ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুমারস্বামী পর্যায়ক্রমে ভারত ও ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া শিল্প ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন এবং ভারত ও ইউরোপের নানাস্থানে ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা সম্বন্ধে বহু ভাষণ দান করিয়া প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন; ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন মিউজিয়ম ডেনম্যান রস এর নিকট হইতে কুমারস্বামী কর্তৃক ভারতে সংগৃহীত ধাতব মূর্তি, জৈনধর্ম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, রাজপুত ও মুঘল যুগের অমূল্য চিত্রাবলী প্রভৃতি উপকরণগুলিসহ মিউজিয়মে একটি ভারতীয় বিভাগ প্রবর্তন করিতে মনস্থ করেন। এই সমস্ত অমূল্য শিল্প সম্পদ বিন্যস্ত করা, তালিকাভুক্ত করা এবং উহাদের যথার্থ মূল্যায়ণ দ্বারা ঐ গুলির পরিচয় বিশ্ববাসীর গোচর করার উপযুক্ত পাত্র বিধায় মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ আনন্দ কুমারস্বামীকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আনন্দ কুমারস্বামী বোষ্টন মিউজিয়মে যোগদান করেন। তাঁহাকে প্রথমে মিউজিয়মের ভারতীয় ও দূরপ্রাচ্য বিভাগের 'রিসার্চ ফেলো' ও পরে অধ্যক্ষ (Curator) নিযুক্ত করা হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুমারস্বামী এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর আনন্দ কুমারস্বামী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন সন্নিহিত Needhum নামক স্থানে গৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিতে থাকেন। কুমারস্বামী আমেরিকায় অবস্থিতিকালে Dona Louisa Runstein নাম্নী একজন আর্জেণ্টাইন রমণীকে বিবাহ করেন। কুমারস্বামীর এক পুত্র এই বিদুষী রমণী কুমারস্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী ছিলেন। রাম কুমারস্বামী ভারতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহার সহিতও বহু ভারতীয়ের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আনন্দ কুমারস্বামী রচিত মধ্যযুগের সিংহলী শিল্প বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ পুস্তক প্রকাশিত হয় (১) এই পুস্তকে কুমারস্বামী প্রতিপন্ন করেন যে ভারতীয় সভ্যতাই সিংহলী শিল্পের উৎস। শিল্প সম্বন্ধে কুমারস্বামীর সুপরিচিত একটি মত ছিল যে শিল্পীর শিল্প কর্মের পশ্চাতে একটি ভাব কাজ করিতে থাকে। এই ভাবটির ভিত্তিভূমি সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি ঐক্যের সন্ধান, বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যের সূত্রটি শিল্পীর চেতনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

শিল্প সম্বন্ধীয় এই প্রথম গ্রন্থটিতেই কুমারস্বামী এই মতটি ব্যক্ত করেন। কুমারস্বামীর এই পুস্তকটি শিল্প রসিক ব্যক্তিগণ কর্তৃক সাতিশয় সমাদৃত হয়। ভগিনী নিবেদিতা এই পুস্তকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

এই বৎসরই আনন্দ কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্প কলার আদর্শ সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (২) পর বৎসর কুমারস্বামী জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে কতকগুলি নিবন্ধ একত্রে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তাঁহার বক্তব্য ছিল যে জাতিয় লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মোন্নতি, বৃহৎ কিছু প্রাপ্তির আশায় নহে বড় হইবার জন্যই আত্মোন্নতি আবশ্যক (৩)। এই সময়েই কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্পিদের সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৪)। ইহার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় চিত্রকলার কয়েকটি নিদর্শন ও ব্যাখ্যান সহ কুমারস্বামী একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৫)। অনুরূপ আর একটি পুস্তক দুই খণ্ডে ১৯১০-১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (৬)। ইহার পর কুমারস্বামী কৃত বিশ্বকর্মা নামে একটি পুস্তক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয় (৭)। এই পুস্তকে ভারতীয় ভাস্কর্য, বাস্তু শিল্প (Architecture), চিত্রকলা, হস্তশিল্প প্রভৃতির আলেখ্য ও এতৎ সম্বন্ধীয় মনোজ্ঞ আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়। কুমারস্বামীর ভারতীয় শিল্পকলার ব্যাখ্যান ভারতীয় শিল্প সম্পর্কিত বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া ভারতীয় শিল্প সাধনাকে তাহার যথাযথ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। উত্তর প্রদেশে প্রদর্শনীর জন্য রাজপুতানা ও পাঞ্জাব হইতে কুমারস্বামী প্রচুর চিত্র সংগ্রহ করেন। এই চিত্রগুলি খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু চিত্র শিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত হয়। এই চিত্রগুলি ও ইহাদের ব্যাখ্যাসহ কুমারস্বামী রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশ করেন (৮)। সমগ্র বিশ্বের কলারসিকগণ কুমারস্বামীর এই পুস্তকটিকে অভিনন্দিত করেন। রাজপুত চিত্রকলা বর্তমানে ভারতীয় শিল্পকলাচর্চার ইতিহাসে একটি গৌরবজনক স্থানের অধিকারী হইয়া আছে। রাজপুত চিত্রকলাকে জগতে পরিচিত করার ব্যাপারে কুমারস্বামীই সর্বপ্রথম অগ্রসর হন।

শুধু রাজপুত চিত্রকলা নহে সমগ্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এক কথায় ভারতীয় শিল্পকলাকে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত করিয়া ভারতীয় সভ্যতার মহিমা উদ্ঘাটনে কুমারস্বামীর দান অতুলনীয়। কুমারস্বামীর সমসাময়িককালে ই. বি. হ্যাভেল (E.B. Havell, 1861—1934) ভারতীয় শিল্পের মর্ম অনুধান করিয়া ভারতীয় শিল্পের মহিমা প্রচারে ব্রতী হন। হ্যাভেলের ভারত-শিল্প মহিমা প্রচার প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে আবেগ প্রণোদিত ছিল; কুমারস্বামী ভারতশিল্পের মহিমা প্রচারে আবেগের আশ্রয় লন নাই। ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য, ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি লইয়া তিনি ভারতশিল্পের মহিমা বিচার বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা সহকারে ইউরোপ আমেরিকা সহ সমগ্র বিশ্বে অজস্র পুস্তক, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করিয়া যান। কুমারস্বামী বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীতশাস্ত্র, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ দর্শনেও তিনি লব্ধ প্রবেশ ছিলেন। বহুমুখী পাণ্ডিত্য সম্পন্ন কুশাগ্রধী কুমারস্বামী শুধু ভারতীয় শিল্প নহে ভারতীয় সাহিত্য ও সঙ্গীতেরও একজন নিপুণ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ভারত শিল্পের

মর্মোদ্ঘাটনে পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন; পরবর্তীকালে তিনি একান্তভাবে ভারতীয়শিল্প ব্যাখ্যা ব্যতীত সাধারণভাবে ভারতীয় সভ্যতার নিগূঢ় মর্ম ব্যাখ্যাতারও ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রতীচ্যদেশে ভারত সভ্যতার মর্মবাণী প্রচার করিয়া তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিতে সচেষ্ট হন এবং বহুলতাকে। সাফল্য লাভ করেন প্রাচ্যসভ্যতার মর্মবাণী প্রতীচ্য জগতে প্রচার দ্বারা প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে মৈত্রী ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করিতে কুমারস্বামীর এই প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। প্রথম জীবনে কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার ব্যাখ্যাতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া শেষ জীবনে এই সূত্রেই জগতের একজন প্রমুখ চিন্তানায়ক, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ রূপে পরিগণিত হন। প্রাচীন ভারতবাসী জীবন সংগ্রামের মধ্যেও শান্তি ও সম্প্রীতির সহিত বাস করিবার রহস্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই রহস্যের মর্ম বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করিয়া কুমারস্বামী সমগ্র মানবজাতিকে একই মিলনসূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যেও ইউরোপ আমেরিকায় বহু বক্তৃতা দান করেন এবং বহু পুস্তক রচনা করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুমারস্বামী বোষ্টন মিউজিয়মে কর্মরত ছিলেন। তিনি সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত স্নানাহারের সময় ব্যতীত অবশিষ্ট সময় বিদ্যাচর্চা করিতেন। কুমারস্বামীর ৬৫তম জন্মদিবসে আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কুমারস্বামী রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহাতে পঞ্চশতাধিক রচনার উল্লেখ আছে। ইহার পর কুমারস্বামী আরও পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেও বহু পুস্তক তাঁহার দ্বারা রচিত হয়। সুতরাং কুমারস্বামীর সমস্ত রচনাবলীর পরিচয় প্রদান দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানে তাঁহার আর কয়েকটি মাত্র রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিশ্বের অনন্তসৃজনী লীলাই শিবনৃত্যের মাধ্যমে রূপকের আকারে বিধৃত হইয়াছে এই ব্যাখ্যান সহ কুমারস্বামীর একটি প্রবন্ধ পুস্তক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হয় (৯)। বোষ্টনের চারুকলা সংগ্রহালয়ের (Museum of fine Arts, Boston) ভারতীয় শিল্প নিদর্শনগুলির সচিত্র ও মনোজ্ঞ বিবরণও কুমারস্বামী চারিটি বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ করেন (১০)।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় শিল্পের ইতিবৃত্ত কুমারস্বামীর আর একটি যুগান্তকারী রচনা (১১)। কুমারস্বামী রচিত আর কয়েকটি পুস্তকের নামও নিম্নে দেওয়া হইল (১২-৩৪)। পুস্তকের নামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কুমারস্বামীর গভীর মনীষা ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যের পরিধি সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। কুমারস্বামী জগতের বহু বিদ্বৎসংস্থার সম্মানিত সদস্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। নানা প্রশ্ন সমাধানের জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তাঁহার সহিত কিছু ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিত অথবা পত্র লিখিত। কুমারস্বামী দীর্ঘায়বয়ব-সম্পন্ন সৌম্যদর্শন সুপুরুষ ছিলেন। এই সদালাপী মানবপ্রেমিক মনীষীর সান্নিধ্যে আসিলে যে কোন ব্যক্তিই অন্তরে শান্তিলাভ করিত। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলম্বো, লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও ভারতের নানাস্থানে কুমারস্বামীর জয়ন্তী উৎসব সাতিশয় আড়ম্বরসহ উদ্‌যাপিত হয়। কুমারস্বামীর ইচ্ছা ছিল যে পর বৎসর কর্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি ভারতে আসিবেন

এবং হিমালয়ের একটি নিভৃত অঞ্চলে হিন্দুধর্মসম্মত বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বাস করিবেন। কুমারস্বামীর এই শেষ বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এই বৎসরেই (১৯৪৭) ১০ই সেপ্টেম্বর আকস্মিকভাবে স্বগৃহেই (Needham, Boston) কুমারস্বামী পরলোকগমন করেন। কুমারস্বামী তাঁহার প্রিয় পিতৃভূমি ভারতে আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই বটে তবে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার চিতাভস্ম পবিত্র বারাণসীধামে নীত হয় এবং উহা গঙ্গাসলিলে বিসর্জিত হয়।

ভারত তথা বিশ্বপ্রেমিক মনীষী ও চিন্তানায়ক কুমারস্বামীর মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ব শোকমগ্ন হয়।

---

(১) Medieval Sinhalese Art, 1908. (২) The aims of Indian Art, 1908, (৩) Essays in National Idealism ; 1909, 1911. (৪) The Indian Draftsmen, London, 1909. (৫) Selected Examples of Indian Art, London, 1910. (৬) Indian Drawings, 2 vols, 1910-12. (৭) Visvakarma, Bombay, 1912-14. (৮) Rajput Paintings, London, 1916. (৯) The dance of Siva—New York, 1918. (১০) Catalogue of Indian Collections in the Boston Museum of fine Arts ; 1923, 1924, 1927, 1930. (১১) History of Indian and Indonesian Art ; London, 1927. (১২) Art and Swadeshi, 1912. (১৩) Notes on Jaina Art, London, 1914. (১৪) Budha and the gospels of Buddhism, New York, 1916 ; Calcutta, 1955. (১৫) Indian Music, New York, 1917. (১৬) The influence of Greek on Indian Art, 1908. (১৭) An Introduction to the Indian Art, Madras, 1923. (১৮) The origin of Buddha Image, New York, 1927. (১৯) The Arts of India and Ceylon, London, 1938 (also in French). (২০) Yakhas—Washington, 1928-31. (২১) Archaic Indian Terracottas ; Leipzig, 1928. (২২) Bibliographies of Indian Art, Boston, 1925. (২৩) Asiatic Art, Chicago, 1938. (২৪) Is Art a superstition or a way of life, 1937. (২৫) A new approach to the Vedas, London, 1933. (২৬) Christian and oriental philosophy of Art, 1939. (২৭) The transformation of nature in Art, 1934, (২৮) Elements of Buddhist Iconography, Cambridge (Mass), 1935. (২৯) Spiritual Authority and temporal power, the early Indian theory of Government, 1942, (৩০) Hinduism and Buddhism, New York, 1943. (৩১) Figures of Speech and thought, London, 1946. (৩২) Religious basis of forms of Indian Society, 1946. (৩৩) Why exhibit Works of Art ? London, 1943. (৩৪) Time and Eternity, 1947. (৩৫) Am I brother's keeper, 1947.

বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন চিন্তা ও বাঙালী সমাজ-মন

অলোক রায়

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে), তখনও পর্যন্ত বাঙালী সমাজ-মন মোটের উপর বহির্মুখী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাজ-জীবনে যে জাগরণ লক্ষিত হয়, তাতে পাশ্চাত্য ভাবানুকরণ সর্বব্যাপী ছিল। য়োরোপীয় সাহিত্য ও দর্শন বাঙালীর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রবন্ধ লিখছেন, তখন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছে বটে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র তখনও 'রাহুগ্রাস মুক্ত' হয়নি। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র ধর্ম-দর্শন আলোচনা 'বঙ্গদর্শনে'ই প্রকাশিত হয়।

'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রিকা একই বৎসর প্রকাশিত হয় (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমাদের সমাজ-মন বিশেষ পরিবর্তন লাভ করে ; যার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান' এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের উন্মেষ। 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমচন্দ্র ও 'প্রচারে'র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয় ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে : 'বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহনবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না ; প্রচারের পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে রাহুগ্রাস মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান্ দেখি।' ('বঙ্কিমচন্দ্র'—চরিতকথা ১৩৬৫, পৃঃ ৩৬)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে ধর্ম এবং দর্শন সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। যথা—সাংখ্য দর্শন, ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, মনুষ্যত্ব কি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি। বলাবাহুল্য এর কোনো প্রবন্ধটিকেই বিশুদ্ধভাবে ধর্ম বিষয়ক বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে যা জীবন জিজ্ঞাসা, 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তাহাই ধর্মজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ জীবন লইয়া কি করিব ? লইয়া কি করিতে হয় ?'—এই প্রশ্ন যৌবন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে দেখা দিয়েছে।

'বিবিধ প্রবন্ধে' সংকলিত 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধটি এই দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ; সেখানে 'মনুষ্যত্ব' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছেন, 'মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে' তার তত্ত্ব। লক্ষ্য করতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মজিজ্ঞাসু হয়েও, প্রচলিত ধর্মচর্চা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী নন। 'ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ এবং হরিনাম সংকীর্তন' কিংবা 'রবিবারে কার্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়া নয়ন নিমীলন এবং খ্রীস্টধর্ম ভিন্ন ধর্মান্তরে বিদ্বেষ' প্রভৃতি সাধারণতঃ 'পুণ্যকর্ম' বলে বিবেচিত হলেও, 'পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তা সর্ববাদিস্বীকৃত নহে ; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র।' অন্যদিকে, আধুনিক সমাজ-জীবনে 'বাহ্যসম্পদ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

অতঃপর জন্ স্টুয়ার্ট মিলের 'হিতবাদে'র অনুসরণে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—১। পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি প্রযোজন, ২। পরলোকে ফলপ্রাপ্তির জন্য পুণ্যকর্মানুষ্ঠান নয়, ইহলোকে

ফলপ্রাপ্তিই সঙ্গত, ৩। 'যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।'

এইখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'মনুষ্য কি' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন চরিতের আলোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে যে 'অনুশীলন—ধর্ম' বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে।''

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর য়োরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তা কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার পরিচয় আছে 'বিবিধ প্রবন্ধে'; প্রধানতঃ কোম্‌তের পজিটিভিস্‌ম, বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজম, মিলের র‍্যাশনালিজ্‌ম (ক্ষেত্র বিশেষে মিল বেন্থামের অনুগত শিষ্য), এবং স্পেন্সারের অ্যাগ্‌নস্‌টিসিজ্‌ম্ উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, এবং বিশেষ করে কোম্‌ত ও মিল আজীবন তাঁকে অল্প বিস্তর প্রভাবিত করে। এই জন্যই বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন : 'He interpreted the Dharma from the Hindu philosophy in the light of empirical, utilitarian and positivist philosophy of Bacon, Bentham, Mill and Comte'

কিন্তু 'বিবিধ প্রবন্ধে' 'ধর্ম' প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। 'ধর্মে'র ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন' গ্রন্থে। 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধেও অনুশীলন তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু তা যেন 'বিলাতী Doctrine of Culture'। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র য়োরোপীয় 'অনুশীলন তত্ত্বের' সঙ্গে নিজের আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট নির্দেশ করেছেন : 'বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলন তত্ত্ব জগদীশ্বর পাদপদ্মেই সমর্পিত।' 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পথ জ্ঞানের পথ, 'ধর্মতত্ত্বে'র পথ ভক্তির পথ।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধটিকে আমরা 'মনুষ্যত্ব কি' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের সেতু-স্থল বিবেচনা করতে পারি। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধ 'প্রচারপত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৯২) প্রকাশিত। সুতরাং রচনা-কাল বিচারে 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অধিকাংশ প্রবন্ধ থেকে 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধটি দূরে অবস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবন্ধটিকে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের 'সারবত্ত' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তিনি প্রথমেই বলেছেন—'যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।' 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে 'ধর্মতত্ত্ব' (অনুশীলন) গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। 'চিত্তশুদ্ধি' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছেন 'মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্তি, পরিণত ও সামঞ্জস্যের সহ।' 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধেও এই প্রবন্ধের মতই বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে—কিন্তু এখানে

'ধর্মতত্ত্বে'র প্রভাবেই 'কার্যকারিণী বৃত্তি'র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'ভক্তি ও প্রীতি কার্যকারিণী বৃত্তি।' বলা বাহুল্য 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে 'ভক্তি'র উল্লেখ মাত্র ছিল না।

এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে বর্তমান প্রচলিত গ্রন্থটির তুলনা করলে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন : 'আমার জীবনে আমি অনেক মত পরিবর্তন করিয়াছি,—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ের ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত বৈবজ্ঞান বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীনএবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।'

যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মালোচনায় উৎসাহী ছিলেন না। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি বলেছিলেন (আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) : 'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি।' (বঙ্কিম প্রসঙ্গ। পৃঃ ১৯৪)। এবং কালীনাথ দত্তও লিখেছেন : বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত।' (বঙ্কিম প্রসঙ্গ। পৃঃ ২২০)।

পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' লিখলেন : 'যদি বল ঈশ্বর মানিনা, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি।' হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনচিন্তা আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন : 'শেষ দশ বৎসর (১৮৮৪—১৮৯৪) বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ধর্মালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি স্বভাবতঃ নবীনতার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার প্রাচীনতার প্রতি পক্ষপাত হয়।' (দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,১৩৪৭। পৃঃ ১৬)।

'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী, তিনি প্রত্যক্ষবাদী। সত্য আবিষ্কারে তিনি প্রয়াসী। কিন্তু অধিকাংশস্থলে এ সত্য বহির্জাগতিক। অন্ততঃ বহির্জগৎ নির্ভর। উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপীয় চিন্তায় যে বিজ্ঞানমুখিতা দেখা যায়, 'বিজ্ঞান রহস্যে'র লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও স্বভাবতঃই সে পথ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'জ্ঞান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় দর্শনকে অবলম্বন করে যাত্রা সুরু করলেও, য়োরোপীয় দর্শনকেই সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অদম্য আত্মশ্লাঘা চালিত হয়ে, সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন : 'আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্যগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমন তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।'

'জ্ঞান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে লক, হিউম, বেন ও মিলের এম্‌পিরিক্যাল ফিলজফির দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন : 'প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। কিন্তু প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশের সময় পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করলেন—'এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।' শুধু তাই নয়, 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি আরও স্পষ্ট করে বললেন : 'সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে। ইহা ভাগবদ গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।'

প্রসঙ্গত 'বিবিধপ্রবন্ধে'র 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখ করতে পারি। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্রে লিখেছেন —the Sankhya is the only system of which I have made anything like a study' (Bengal : Past and Present, April-June 1914)। এবং 'বঙ্গদর্শনে' সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ক্যালকাটা রিভ্যু (১৮৭১) পত্রিকায় 'Buddhism and the Sankhya Philosophy' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'সাংখ্যদর্শন' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কারণ : 'The Sankhya is remarkably sceptical in its tendency ; many antiquated or contemporaneous errors were swept away by its merciless logic. Carried to its legitimate consequences, a wise scepticism might have contributed to the lasting benefit of Hindu progress.' বলাবাহুল্য উক্তির মধ্য দিয়ে আধুনিকমনা সংস্কার-ইচ্ছুক বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রকাশ হয়েছে। 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন : "পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা 'নিরীশ্বর সাংখ্য'কেই সাংখ্য বলিতেছি।" প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বিস্তৃতভাবে সাংখ্যের নিরীশ্বরতার ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও এই আলোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রমাণিত হয় না, তবু একথা বলা যায়, যুক্তিনির্ভর সাংখ্যদর্শনের বিশ্লেষণাদি বঙ্কিমচন্দ্রের ভালো লেগেছিল।

অন্যদিকে 'সাংখ্যদর্শন' আলোচনার যে সকল কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে সমাজতত্ত্ব আবিষ্কার ও ব্যাখ্যাই প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্র 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' (মে '১৮৭৩) পত্রিকায় 'The Study of Hindu Philosophy' নামে প্রবন্ধেও লিখেছেন : 'The principal value of Hindu Philophy consists in its bearings on history and on sociology' সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে দেখি : 'যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না ; কেন না, হিন্দু সমাজের পূর্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক পাইবেন।' দর্শকের বিভিন্ন মত ও পথের মধ্যে যে সামাজিক তাৎপর্য নিহিত আছে, উনবিংশ শতাব্দী থেকেই যোরোপে তার আলোচনা সুরু হয়। সেদিক দিয়ে দর্শনের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষে নূতন পথ প্রদর্শন করেন।

'ত্রি দেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে, প্রবন্ধের বিষয় হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি। লক্ষ্য করতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র জ্ঞানানুশীলনের উৎসাহেই মিল ও ডারউইনের বিভিন্ন আলোচনা

করেছেন (প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন নাম ছিল 'মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম') প্রকৃতপক্ষে এই প্রবন্ধটি প্রমাণ করে, বঙ্কিমচন্দ্র কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে মিল ও ডারউইনের লেখা পড়েছিলেন। প্রবন্ধটির মূল প্রেরণা আত্মশ্লাঘা,—'ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্মাপেক্ষা হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞান সম্মত এবং নৈসর্গিক।' এবং মিল ও ডারউইনের জগৎ সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংস সম্পর্কে আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে 'ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে।' বলাবাহুল্য এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের তথা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-ধর্মের দ্বিধা এবং প্রত্যয়, আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদ যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন-চিন্তা এই দিক দিয়ে বিশেষ সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ।

বিহারীলালের কাব্যের পুনর্বিচার

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সারদামঙ্গল

সারদামঙ্গল বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনারূপে স্বীকৃত বলে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচ্য। সমালোচকেরা বলেছেন, এই রচনারই লিরিক মেজাজের পূর্ণ অবারিত প্রকাশে আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে গীতিকবিতার সূত্রপাত হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গলের কাছে নিজের ঋণ উচ্ছ্বসিতভাবেই স্বীকার করেছেন।

কাব্যটির প্রথম সর্গের প্রথম চারটি স্তবকের সারদাবন্দনায় উপক্রমণিকা রচিত। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুটি পংক্তির রূপ বর্ণনায় অসঙ্গতি লক্ষণীয় : 'কে তুমি ত্রিদিববেদী বিরাজ হৃদি কমলে! নধর নগনা লতা মগনা কমল দলে'—হৃদয়কমলে বিরাজমানা ত্রিদিবদেবীর রূপ মহিমার সঙ্গে কমলদলে মগ্না নধর লতার চিত্রকল্পটি মেলে না। চতুর্থ স্তবকে কবি সারদাকে 'নিশান্তের শুকতারা', চাঁদের সুধায় ধারা', 'মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিনী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তার উদ্দেশে বলেছেন :

তুমি সাধনের ধন
জ্ঞান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে!

পূর্ববর্তী পংক্তিগুলোর ভাবপারম্পর্যে ভাবালুতার শেষ অগভীর পংক্তিটি আসেনি, সেটিকে বিচ্ছিন্নভাবেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে এসেই আকস্মিকভাবে সমগ্র স্তবকটির তালভঙ্গ হয়। বাল্মীকির প্রসংগেও কল্পনার সংগতিবিহীনতা দ্রষ্টব্য : শোকার্ত ক্রৌঞ্চীদর্শনে কাতরা সারদার করুণ সংগীতে বাল্মীকি করুণায় উদ্বেলিত হন :

রোমাঞ্চিত কলেবর,
টল্‌মল থর্‌থর্
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল!

যোগাসনে বিভোর বিহ্বল মনে ধ্যানরত যোগেন্দ্র বাল্মীকিকে চটুল হাসি হেসে লক্ষ্মীর প্রলুব্ধ করার চিত্রটি প্রাসঙ্গিকতাহীন, বিসদৃশ, তেমনি এই দেবীর সম্পর্কে পৌরাণিক ধারণার বিরোধী : 'কমলে ঠমকে হাসি ছড়ান রতন রাশি, অপাঙ্গে ভ্রূ-ভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও!'

পরবর্তী দুটি স্তবকে (১৯ ও ২০) পাই করুণাস্বরূপিনী সারদার প্রশস্তি। এই করুণাদেবীকে কবি আহ্বান করেন : এস মা করুণা-রাণী; ও বিধু-বদনখানি হেরি, হেরি, আঁখি ভরি হেরি গো আবার! পরের অংশে বিচ্ছিন্নভাবেই যে রূপকল্পনায় সারদাকে উপস্থাপিত করা হয় তার সঙ্গে করুণামূর্তির কোনও যোগ থাকে না : ব্রহ্মার মানসসরোবরের নীল জলে স্বর্ণপদ্মের ওপর চরণ স্থাপিত করে 'ষোড়শী রূপসী' সারদা, স্ফটিকনিকেতনে যেমন সুন্দরী যেদিকেই তাকায় সেইদিকেই তার 'কুহকিনী ছায়া' হাসে, তেমনি সেই মানসসরোবরের 'লাবণ্যদর্পণঘরে 'দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী

দেখিছেন মায়া' স্ফটিকনিকেতনের মতই ব্রহ্মার মানসসরোবরের লাবণ্যদর্পণঘর—সেই অসার্থক তুলনায় সৌন্দর্যের কোনও চিত্রও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। এই লাবণ্যময়ীর চারিদিক ঘিরে যেন রূপসী চাঁদের মালা ঘুরে বেড়াচ্ছে, লাবণ্যময়ী তাদের রূপের ছটায় ভুলে শ্বেত শতদল তুলে তাদের সীমন্তে পরাতে যান, তারাও তাঁর মত পদ্ম তুলে তাঁর সীমন্তে পরাতে যায়—

অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়,
চমকি আপন-পানে চাহেন রূপসী।

২১ সংখ্যক স্তবকে 'সুবর্ণ নলিনী', ২৪ স্তবকে কাঞ্চন-কমলরাজি, আর এই স্তবকে 'শ্বেতশতদল'—ব্রহ্মার মানসসরোবরের পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন এই বর্ণনা অবিশ্যি বিহারীলালের কল্পনার বিশৃংখলার খুচরো উদাহরণ মাত্র। ষোড়শী রূপসীর চারদিকে তাঁর প্রতিরূপ 'রূপসী চাঁদের মালা' শুধু 'কুহকিনী ছায়া,' 'মায়া', 'স্বপন প্রায় বিভ্রম', এই অস্থির কল্পনাবিলাসে লাবণ্যময়ী সারদা 'বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তি'তে পরিণত হননি, তাঁর প্রতিরূপ 'অসংখ্য ছায়া' 'রূপসী চাঁদের মালা' শুধু তাঁর অলংকরণ মাত্র। বিশ্ব সৌন্দর্যের ছন্দে এই লাবণ্যময়ীর লাবণ্য প্রাণ পায় না, তাই স্বপ্নের মত বিভ্রম ভেঙ্গে যায়, রূপসীকে চমকে উঠে নিজের দিকেই ফিরে তাকাতে হয়; অর্থাৎ সারদা এখানে অনেকটা পরিমাণেই কবির নিজস্ব ক্ষণজীবী স্বপ্নবিলাসসম্ভোগপ্রবণতার মাধ্যম। বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতীকী বিন্যাসের সংহতিতে সারদাকে ধরার মত নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা বিহারীলালের ছিল না। এই সারদা দেবী শেলীর প্লেটোর আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত spirit of Beauty-র সঙ্গে কোনও ভাবেই তুলনীয় নয়, বিহারীলাল এই কাব্যের কোথায়ও দার্শনিক তত্ত্বঘটিত অনুভূতিতে তাঁর আরাধ্যাদেবীর সত্তাকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি, তাঁর মেজাজের সঙ্গে এজাতীয় তাত্ত্বিকতা খাপ খায় না।

সারদার ষোড়শী মূর্তি বর্ণনার পর কবি তাঁর সম্বন্ধে যে আবেগ প্রকাশ করেছেন নিজস্ব সীমায়ই তা অনেক শুদ্ধ, নির্মল :

তোমারে হৃদয়ে রাখি— তুমিই মনের তৃপ্তি,
সদানন্দ মনে থাকি, তুমি নয়নের দীপ্তি
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভালো লাগে; তোমা-হারা হলে আমি প্রাণ-হারা হই;
গিরিমালা, কুঞ্জবন, করুণা-কটাক্ষে তব
গৃহে নাট-নিকেতন, পাই প্রাণ অভিনব,—
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।

সারদার উপলব্ধি এই প্রশস্তির পরই আকস্মিকভাবেই তাঁর সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ আসে। প্রথমে পাই সারদার অদর্শনে কবির সম্ভাব্য দুর্গতির কল্পনা : তিনি লোকালয় ত্যাগ করে নিবিড় বনে কেঁদে বেড়াবেন, তাঁকে দেখে তরুলতা বিষাদে কথা বলবে না, কুসুমকুল বিষণ্ণ হবে এবং—'হা দেবী, হা দেবী, বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি; নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে।' নির্ঝরের ঝর্ঝর রবে যখন কাননের সেই ক্রন্দন সুরপুরে ধ্বনিত হবে, তখনই হয়ত দেবীর আসন টলবে, কবির কথা

তাঁর মনে পড়বে : 'হেরিবে কাননে আসি অভাগার ভস্মরাশি ; অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায়…।' দেবী তখন যে ভাবে শোকার্ত হবেন সেটা ভেবেই তিনি বলেন—'মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে।' কিন্তু এদিকে জীবন দুর্বিসহ :

বেঁধে মারে, কত সয় ! অন্তরাত্মা জর জর,
জীবন যন্ত্রণাময়— জীর্ণারণ্য চরাচর,
ছারখার চুরমার বিনি বজ্রাঘাতে কুসুম-কানন-বিজন শ্মশান।

প্রথম অংশের সারদার অদর্শনে কবির সম্ভাব্য দুর্গতির চিত্রটি আলংকারিক, অগভীর, তেমনি দ্বিতীয় অংশে জীবন যন্ত্রণার নাটকীয় উক্তিগুলোয় অস্তিত্বের কোনও গভীর যন্ত্রণার সুর বাজেনি। সারদার করুণাকটাক্ষে কবি অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে থাকেন, এই স্বীকৃতির পর অসংলগ্নতাই যন্ত্রণাময় জীবনের উল্লেখ আসে, কোন দ্বন্দ্বময় অসঙ্গতির বেদনায় তাঁকে সারদাকে হারাতে হয়, তার কোনও ইঙ্গিত ছাড়াই এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা প্রকাশিত হয় : 'কি করিব, কোথা যাব, কোথা গেলে দেখা পাব, যদি—কমল-কামিনী কোথারে আমার ?' কবি তাঁর সঙ্গে সারদার সম্বন্ধ কোনও বিকাশের সুসংলগ্ন স্তরপরম্পরায় রূপায়িত করেন না, তাই এই জীবনযন্ত্রণা ও বিচ্ছেদবেদনা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন।

দ্বিতীয় সর্গের নবম এবং দশম স্তবকে দেখি, সারদার বিরহে জগৎ বিষণ্ণ এবং কবির মন নিরানন্দ ('কেন সুখ নাই মনে, সব গেছে তার সনে ; খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার !' তারপর সারদার বিষণ্ণ মূর্তি, 'অয়ি, একি, কেন, কেন, বিষণ্ণ হইলে হেন ? আনত আনন-শশী, আনত নয়ন……। কবি তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন :

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু-ময় জীবন-লহরী !

এই মরুভূমিতে মরীচিকার ছলনায় তাঁকে অস্থির হতে হয় :

কভু মরীচিকা-মাঝে এত যে যন্ত্রণা-জ্বালা
বিচিত্র কুসুম রাজে, অবমান, অবহেলা,
উঃ ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল ! তবু কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি !

কবি তাঁর যন্ত্রণাকে আরও নাটকীয়, আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলেন।

ভাবিতে পারিনে আর ! তরংগিয়া রক্তরাশি
অন্ধকার—অন্ধকার— নাকে মুখে চোখে আসি
ঝটিকার ঘূর্ণি ঘোরে মাথার ভিতরে বেগে যেন ভেঙে ফেলে, ধর, ধর, ধর !—

দেবী বিষণ্ণতা ও বিমূঢ়তা, মরুভূমির মত কবির জীবনের শূন্যময়তা, মরীচিকার বিভ্রান্তির জ্বালা-যন্ত্রণা, অপমান-অবহেলা, অবশেষে তাঁর মূর্চ্ছাতুর অবস্থা—সারদার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ কয়েকটি অসংলগ্ন তরল ভাবোচ্ছ্বাসেই পর্যবসিত, অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণার পটে মূল্যবোধের শুদ্ধতায় স্থিত হবার আবেগবিভাসে এই সারদাসন্ধান কোনও তাৎপর্যময় সংহতি পায় না। 'মরু—মরু—মরুময়,' 'উঃ ! কি বিষম বাজে, কি করি, কি করি,' 'অন্ধকার—অন্ধকার,' 'ধর, ধর, ধর'—এই সমস্ত অংশের কৃত্রিম

নাটকীয়তায় আড়ম্বরপূর্ণ ভাষণেই বোঝা যায়, সারদার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ এখানে গভীর জীবন সন্ধানের ব্যাপার নয়, অংংবিলাস মাত্র।

পরবর্তী অংশে ভাষণাত্মক ভঙ্গি, declamation-এর স্থূলতা আরও প্রকট :

ধর আত্মা ধৈর্য ধর, মহান মনেরি তরে,
ছি ছি ! একি কর কর, জ্বালা জলে চরাচরে,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত ! পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় !
থাকিবা প্রিয়ার বুকে হিমাদ্রিই বক্ষ'পরে
যাই বা মরণ-মুখে, সহে বজ্র অকাতরে !
এ আমি আমিই রব, দেখুক জগত। জ্বলে জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায়।

সারদার করুণার জন্য ব্যাকুলতায় 'এ আমি, আমিই রব, দেখুক জগত' উচ্চ কণ্ঠের এই ঘোষণা অসমঞ্জস। 'একি কর কর'—এই দ্বিত্বে ছন্দের সুর নষ্ট হয়েছে। 'হিমাদ্রিই বক্ষ পরে সহে বজ্র অকাতরে', হিমাদ্রির সহজ ক্ষমতার সহনীয়তার বৈপরীত্যে 'মঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায়' এই চিত্রটি একেবারেই অসার্থক, এই পংক্তিটিতে গোটা স্তবকটারই তালভঙ্গ হয়।

নিজের মহত্ত্ব প্রদর্শনের পরই কবি আবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেন :

হা ধিক্ অধীর হেন ! প্রণয় পবিত্র ধনে
দেখেও দেখ না কেন সন্দেহ করোনা মনে—
দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণ-প্রতিমায় নাগর দোলায় দোলা শিশুরি মানায়।

পূর্ববর্তী স্তবকগুলোয় কবি তাঁর যন্ত্রণা জ্বালাকে বেশ গুরুতর রূপেই উল্লেখ করেছেন, এত যে যন্ত্রণা-জ্বালা, অপমান, অপহেলা,' এই জ্বালার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর নাকে মুখে চোখ রক্তের তরঙ্গ আছড়ে পড়ে, এত মহান্ মনের সহ্য করার মত জ্বালা, নীলকণ্ঠের মত যা ধারণ করার এবং হিমাদ্রির মত যাকে বুকে পেতে নেবার জন্য তিনি নিজের মনকে আহ্বান জানিয়েছেন, দ্বিতীয় স্বর্গের এই শেষ স্তবকটিতে সেটাই এই নিছক সন্দেহে পরিণত, যার তুচ্ছতার জন্য তিনি নিজেকেই ভৎর্সনা করেন : 'নাগর দোলায় দোলা শিশুরি মানায় !'

তৃতীয় স্বর্গের প্রথম থেকে পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত সারদার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ প্রেম ও ব্যবধানের বৈপরীত্যমূলক সমাবেশের চিত্রে উপস্থাপিত : নয়নরঞ্জন পূর্ণিমার আলোক, মাঝখানে উদ্বেলিত নদী, সারদা ও কবি, চক্রবাক ও চক্রবাকী, দুজন দুপারে ; দুজনের—'নয়নে নয়নে মেলা, মানসে মানসে খেলা,' সেই সারদা, সেই কবি, সেই সব কল্পতরু, কুঞ্জবন, সেই প্রেম, স্নেহ, প্রাণ, দেহ—সবই এক আছে, তবু 'কেন মন্দাকিনী-তীরে দু-পারে দু জন !' দুটি প্রাণই ব্যাকুল, মিলিত হবার জন্য ধাবমান, কিন্তু 'কেন এসে অভিমান সমুখে উদয় !' সারদার প্রেমোজ্জ্বল চোখ দেখে কবি সংকল্প গ্রহণ করেন :

এমন পদার্থে হেলি
যাব না, যাব না ঠেলি
উভয়-সংকটে আজ মরি যদি মরি !

এই প্রেমের দ্বন্দ্ব, 'উভয়-সংকট' প্রথাসিদ্ধ আলংকারিক প্রেম বর্ণনার অভিমান মাত্র,

বাস্তবজীবনোৎসারিত চৈতন্যের গভীরতায় তা বিধৃত হয় নি। এর মধ্যেই কবি একবার জীবনের সম্মুখীন হন, তার সার্থকতার প্রশ্ন তোলেন :

কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর ?

কিন্তু এই প্রশ্ন তাঁকে জীবনের উৎসে টেনে নিয়ে যায় না, সারদার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কোনও পর্যায়েই চৈতন্য বিস্তারের যন্ত্রণাময় আকুলতায় তার সত্তা মথিত হয় না। কবি নিজের আত্মকেন্দ্রিক কল্পনার জগতে ফিরে গিয়েই স্বস্তি পেতে চান।

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান !

তাঁর দৃষ্টির ভুবন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, 'বিচিত্র মস্তদশা' স্বপ্নবিহ্বলতার মুহূর্তেই তাঁর 'হৃদয়ের উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জলে,' আর তার মাঝখানেই তিনি 'বিশ্বমোহিনী' সারদা কল্পমূর্তিকে পান, তার আলোয়ই প্রেমের প্রতিমা আলোকিত হয়। কিন্তু এই ধ্যানেও কবি স্থিত হতে পারেন না, এই কল্পনাবিভোরতা তাঁকে অমৃতের প্রসাদ এনে দিতে পারে না, এ জগৎ আকস্মিকভাবেই চূর্ণ হয় :

আচম্বিতে একি খেলা — এমন ঘুমের ঘোরে—
নিবিড় নীরদ মালা ! — জাগালে কি জোর করে ?
হা হা রে, লাবণ্য-বালা লুকাল লুকাল ! — সাধের স্বপন আহা ! ফুরাল, ফুরা ল !

স্বপ্ন এবং বাস্তবের সংঘাতের বেদনায় স্বপ্নও অনেক সময় লিরিক বিন্যাসে জীবনের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু বিহারীলালের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের অসংলগ্নতায় স্বপ্ন শুধু ভাবের বুদ্বুদবিলাসেই পর্যবসিত হয়।

ঐ স্বপ্নচারনার পর সারদা কাহিনীর শরীরী জগতেই কবিকে দেখা দেন, দেখা দিয়েই আবার আত্মগোপন করেন, বেদনার্ত কবি মন্দাকিনীকে সম্বোধন করে বলেন—

এই না তোমারি তীরে — করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে !
দেখা আমি পেনু ফিরে, — হারায়ে নয়ন তারা
তুলে কেন না রাখিনু বুকের ভিতরে ! — হয়েছি জগত-হারা,
হা ধিক্ রে অভিমান, — ক্ষণে ক্ষণে আপনারে হারাই হারাই !
গেল, গেল, গেল প্রাণ,

এই সারদা নিশ্চয়ই কবির সেই আগেকার নিদ্রাঘোর, মত্তদশার নন, তাহলে এখানে তিনি 'করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে,' কিংবা সারদারূপ 'নয়নতারা' হারিয়ে 'জগতহারা' হয়েছেন, এসব উক্তি করতে পারতেন না। ইনি স্পষ্টতই তাঁর কাহিনীর নায়িকা, তাই তাঁর অন্তর্ধানে এবার 'সাধের স্বপন আহা !—ফুরাল, ফুরাল, এজাতীয় খেদ নয়, নাটকীয় আড়ম্বরপূর্ণ পাই !

ওহে ভাই, দাও বোলে — দারুণ আগুন শুধু ধূ-ধূ ধূ-ধূ ধায়
কোন দিকে যাব চলে — তুমুল তরঙ্গ ঘোর
ওকি ওঠে জোলে জোলে ? কোথায় পালাই ! — কি ঘোর ঝড়ের মোর,
ওকি ও, দারুণ শব্দ, — পাঁজর ঝাঁজর মোর দাঁড়াই কোথায় !
আকাশ পাতাল স্তব্ধ

কবি আবার তাঁর কল্পনামূর্তির প্রসঙ্গে ফিরে আসেন একটি প্রশ্নে :

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার ?

কল্পনার কি প্রেমের মূল নেই, এই জিজ্ঞাসাও জীবনানুসন্ধানের গভীরতায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি পায় না। যে প্রেমের আত্মদানেই আত্মমুক্তি ঘটে, জীবনের সকল বেদনার কণ্টকই পূর্ণতার ঐশ্বর্যে সার্থক হয়, তা কবির অন্বিষ্ট নয়, তাঁর কাছে প্রেম এক ধরণের আত্মকেন্দ্রিক ভাব মত্তা। তাই এই প্রেমের ফুল ফুটলে—'ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্, আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল…'।

স্বভাবতই নন্দন কাননে কামদেব ও রতির বিহারের বর্ণনা প্রেমের আত্মবিস্তারের রূপক হয়ে উঠতে পারে নি। কামদেব ও রতির প্রেমও নিছক ভাবমত্ততা : তারা—'কি এক ভাবেতে ভোর,' তাদের 'কি যেন নেশার ঘোর,' 'আলসে উঠিছে হাই, ঘুম আছে, ঘুম নাই, কি যেন স্বপন মত চলিয়াছে মনে' এবং 'ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুইজন।' কবি জানেন, 'প্রণয়পবিত্র কাম, সুখ স্বর্গ মোক্ষ-ধাম,' এই মত্ততায় তাঁর মনে একবার বিস্ময় জাগে : 'আমি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ'। কিন্তু এই ব্যতিক্রমে তিনি বিচলিত হন না, এই বিস্ময়ও তাঁর উপভোগের একটি দিক। সুখস্বর্গ মোক্ষধামেই ভাবমত্ততার সমর্থন লাভ করেই কবি তাঁর 'নাই কি প্রেমের মূল ? বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ?' প্রশ্নের উত্তর পান :

এ ভুল প্রাণের ভুল, — এ এক নেশার ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল — অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী ; — স্বপনে বিচিত্র রূপা দেবী যোগেশ্বরী।

স্তবকটির প্রথম তিন পংক্তিকে পরবর্তী পংক্তি এবং পুষ্পকগুলো থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় : এই প্রেম, প্রাণের ভুলই যে কিভাবে 'জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী' হয়ে ওঠে, সারদার চরিত্রে সেই সত্য উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি। 'প্রাণের ভুল' মুহূর্তের মধ্যেই 'নেশার ভুল'-এ পর্যবসিত হয়, অন্তরাত্মার নিদ্রাচ্ছন্নতায়, যোগ-ধ্যানে দেবী যোগেশ্বরী বিচিত্ররূপা হন : কথনও দেখা যায় তাঁর বরাভয় মূর্তি, কখও গেরুয়া বাসে ভীষণ ত্রিশূলধারিণী, 'তাঁর ঘোরঘট্ট অট্ট হাসি ঝলকে পাবক রাশি,' আবার কভু আলুথালু বেশে, শ্মশানের প্রান্ত দেশে জ্যোৎস্নায় আছেন বসি বিষণ্ণ বদনে।' এই যোগনিদ্রা স্বপ্নের 'বিচিত্ররূপা' সারদা শূলধারিণী রূপে যেমন, তেমনি শ্মশানের প্রান্তদেশবাসিনীর মূর্তিতেও আর যাই হোক প্রেমময় জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী হয়ে উঠতে পারেন নি। শ্মশানের প্রান্তদেশে অধিষ্ঠিতা সারদায় ত কবির পক্ষে বেদনাদায়ক, অসহনীয় সেই বিষাদমূর্তিই আত্মপ্রকাশ

করে : এই সারদাকে 'পবন আকুল হয়ে চিতা-ভস্ম রজলয়ে শোকভরে ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গে মাখায়' ; তাঁকে দেখেই কবি আর্তনাদ করে উঠল : 'হায় ফের বিষাদিনী ! কে সাজালে উদাসিনী ? সম্বর, এ মূর্তি দেবী, সম্বর, সম্বর ! এই বিষাদিনী মূর্তি কবি সহ্য করতে পারেন না বলেই সারদাকে উদ্দেশ করে বলেন :

আমার এ বজ্র-বুক, অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন ;
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ, আর আমি কাঁদিব না,
দাও, দাও বসাইয়ে, এড়াই যন্ত্রণা ! আর আমি কাঁদিব না,
অনন্ত নিদ্রার কোলে, নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন !
অনন্ত মোহের ভোলে,

কবির যোগনিদ্রার সাধের স্বপন'ও তাঁকে আশ্বস্ত করে না, তিনি নবীনচন্দ্রের কার্যগুলভ নাটুকে, আড়ম্বরময়উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষণে চমক সৃষ্টি করেন :

হবে না, হবে না আর, উড়ুক পরাণ-পাখী
হয়ে গেছে যা হবার, দেখুক, দেখুক যদি আর কিছু থাকে !
ধোরো না, ধোরোনা, বৃথা রুধো না আমাকে ! ছাড় ! আন ! যাও যাও !
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি বেগে বুকে বিঁধে দাও
ওই যে ত্রিশূল দোলে গগণমণ্ডলে !

চতুর্থ সর্গের মোট আঠাশটি স্তবকের মধ্যে প্রথম সতেরটিতে পাই হিমালয় বর্ণনা, পরবর্তী চারটিতে সারদার জন্য শোক (১৮—২১), সাতটিতে (২২—২৮) হিমালয় নিঃস্তব্ধ গঙ্গার রূপ বর্ণনা ও স্তবক। বিহারীলালের অন্যান্য প্রকৃতি বর্ণনায় মত এখানেও কবির দৃষ্টি শুধু হিমালয়ের বাইরের রূপের ওপর নিবদ্ধ। হিমালয় কবির কাছে—'কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার' ! কখনও সংস্কৃতসাহিত্যানুসারী প্রথাসিদ্ধ চিত্র সংযোজনায়—

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
স্বপ্ন-কেলি—কুতূহলে মত্ত কড়িগণ ;
কখনও বা—মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে, জলধারা ঝরঝর
যেন ধূমকেতু ওঠে, সমীরণ সরসর
ফর ফর তুপ্‌ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল ; চমকি চরন্ত মৃগ চায় চরিদিকে—

নিছক অনুপ্রাসাত্মক ধ্বনিসমারোহে হিমালয়ের বর্ণনাকে কবি গুরুগম্ভীর করে তোলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোথায়ও হিমালয়-প্রকৃতি কিংবা গঙ্গা জীবন্তসত্তা লাভ করেননি।

পঞ্চম সর্গে কবি ঐ পার্বত্য প্রকৃতিতে দাবানলের এক শব্দাড়ম্বরময় বর্ণনা জুড়ে দেন :

অচিপুঞ্জ লক্ লক্ ঝঙ্কা ঝঙ্কা হঙ্কা ছোটে,
ভক্ ভক্ ধ্বক্ ধ্বক্, বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ চর্কি লোটে,
দাউ দাউ, ধূধূ, ধায় দশদিকে : মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে !

অতঃপর আগ্নেয়কাণ্ডের ভীষণতা সম্বন্ধে তাঁর ভাষণ পাই :

দিগঙ্গনাগণ যেন মত্ত যেন রণদক্ষে
আতংকে আড়ষ্ট হেন, তোল্‌পাড় কোরে ধায় দারুণ বাতাস—
অটল প্রশান্ত গিরি বিভ্রান্ত উদাস ; উঃ ! কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস !
চতুর্দিকে লম্ফে ঝম্পে।

এই বর্ণনা ও ভাষণের আড়ম্বর শুধু কৃত্রিম ও স্থূলই নয়, প্রাসংগিকতাবিহীন ঘটনাগত চমক সৃষ্টির লোভে তুচ্ছও বটে। দাবানল সম্বন্ধে ভাষণের পরই আকস্মিকভাবে গঙ্গাস্তুতির উচ্ছ্বাস আসে :

ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গে, চলেছে মা মহোল্লাসে !
তরল তরঙ্গ-রঙ্গে তোমারি পুলিনে হাসে,
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি সুদূর সে কলিকাতা নগরী।

'করি করি' অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্বে ছন্দের যে তালভংগ হয়েছে, সেই খুচরো ত্রুটি ছেড়ে দিয়েই দেখি, এই স্তব কিংবা জন্মভূমির জন্য শোক প্রকাশ—

আহা, স্নেহ-মাখা নাম, এ বিজন গিরি দেশে
আনন্দ-আনন্দ-ধাম, প্রকৃতি প্রশান্ত বেশে
প্রিয় জন্মভূমি, তুমি কোথায় এখন। যতই সান্ত্বনা করে, কেঁদে উঠে মন—
কেন মা, আমার এত কেঁদে ওঠে মন !

সম্পূর্ণ অসংলগ্ন এবং তাৎপর্যহীন : 'কলিকাতা আনন্দনগরী'র 'স্নেহমাখা নাম' স্মরণে কবির আকুলতা কিংবা 'উঃ কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস'—দাবানলের তীব্র উত্তাপ সম্পর্কে নাটকীয় উক্তির পরই বিজন গিরিদেশে প্রকৃতির প্রশান্ত বেশে সান্ত্বনা দানের উল্লেখেই বুঝি, প্রাসংগিকতার নিম্নতম প্রয়োজনটুকুও বিহারীলালের কল্পনার স্বেচ্ছাচারী আত্মবিলাসে স্বীকার্য নয়।

প্রকৃতির কোনও প্রাণময় সম্বন্ধপাতে সারদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বলেই কবি তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি হিসেব প্রকৃতির রূপবর্ণনায় শুধুবক্তৃতাত্মক ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করেন :

অহ অহ, ওহো ওহো বিসর্গ মহান্ মূর্তি
কি মহান্ সমারোহ চতুর্দিকে পায় স্ফূর্তি
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার চতুর্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার

কবি অহ ওহো ইত্যাদি বিস্ময়সূচক শব্দ আড়ম্বরময় বিবরণ (ঘোরঘটা মহাছটা) মহান উদার ইত্যাদি বিশেষণ জড়ো করেছেন, কখনও বা নিছক তথ্যমূলক বিবৃতি দিয়েছেন (উদার পদার্থরাজি সাজি থরে-থর') মাত্র, কিন্তু অভিজ্ঞতার আবেগের প্রাণময় বিন্যাসে চিত্রকল্পের উজ্জ্বল প্রত্যক্ষতায় নিসর্গের মহান মূর্তিকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি : এখানেও বিহারীলাল আত্মপরায়ণতা লালনের উপায় হিসেবে না দেখে নৈর্ব্যক্তিক, শুচি মমতায় তথা গভীরতর জীবনাগ্রহে প্রকৃতিকে ধরার চেষ্টা করেননি, এমন কি সারদার আবির্ভাবের নিছক পটভূমি হিসেবেও তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন না। পরবর্তী অংশে কবি সারদাকে সম্বোধন করে বলেন :

উদার উদারতর এ নিসর্গ রঙ্গভূমি,
দাঁড়ায়ে শিখর পর মনোরমা নটী তুমি ;……
এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিবিধ সুষমা। শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা।

'কি মহান সমারোহ' 'মহানমূর্তি' 'ঘোরঘটা মহাছটা কেমন উদার'—নিসর্গের মহিমা ও গাম্ভীর্য সম্পর্কে এই সমস্ত উক্তি এবং বিরাট হিমালয় শিখরের উপর দণ্ডায়মান, এই উদার প্রকৃতি থেকেও 'উদারতর' ত্রিবিধ সুষমা সারদার মহত্বব্যঞ্জক বর্ণনার পরই প্রকৃতিকে 'রঙ্গভূমি' এবং সারদাকে তার 'মনোরমা নটী' রূপে কল্পনা বিসদৃশ।

এই সমস্ত অসঙ্গতিই প্রমাণ করে যে সারদার মাধ্যমে কবি জগৎ ও জীবনে নিজের হৃদয়কে বাঁধতে পারেননি, দেবীর সন্ধান যেমন অসংলগ্ন ভাবোচ্ছ্বাস, তাঁর প্রাপ্তিও তেমনি নেশাগ্রস্ততা, মত্ত ভাবাবেগ সম্ভোগের ব্যাপার মাত্র—

ও বিধু বদন হাসি সে যেন কি হয়ে যায়
গোলাপ কুসুম রাশি সে যেন কি নিধি পায়
ফুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে ; বিহ্বল পাগল প্রায়
বেড়ায় কি বোকে বোকে আপনার মনে ;

কোনও মূল্যবোধেই সারদার সমগ্রতা পায় না।

'সারদামঙ্গল' আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কাব্যের শ্লোকগুলো কোনও রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করে রাখে না। (অবিশ্যি তিনি এটাকে ত্রুটি হিসেবে ধরতে চাননি)। কবির ভাবোচ্ছ্বাসের এক একটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গদোলায় সারদার করুণামূর্তি সৌন্দর্যরূপ এসেছে এবং এই সমস্ত রূপও কোনও জীবনবোধের তাৎপর্যে প্রাণময় হয়নি। পরবর্তী অংশে যে প্রেমানুভূতির পটে কবি সারদাকে উপস্থাপিত করেছেন সংশয়দ্বন্দ্ব বেদনার মধ্যেই বৃহত্তর জীবনের চৈতন্য ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি ও চরিতার্থতার ঐশ্বর্য তাতে মেলে না। এই সারদার সঙ্গে সৃষ্টিপ্রেরণার কোনও সম্বন্ধ নেই তার অগ্নিদহনে দগ্ধ হতে হতে পরীক্ষার প্রতিটি কঠিন স্তর পার হয়ে অন্তর ও বাইরের নানা বিড়ম্বনার বেদনায়ই একজন কবি কি ভাবে জীবনকে খোঁজেন শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের সেই ইতিহাসের রূপকমর্যাদাও আমরা তাঁর মধ্যে পাই না। এই সারদা যুগ যুগান্তরে ব্যাপ্ত নানা মীথ পুরাণ কাহিনীর জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বা বাঙলার প্রকৃতিতে প্রাণ পায়নি। বিহারীলালের অন্যান্য রচনার তুলনায় সারদামঙ্গলের ছন্দ ও ভাব কিছুটা মসৃণ কিন্তু এখানেও তিনি জীবনাবেগের নির্মল ও সংহত রূপ রচনা করতে পারেননি ; আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের অসংযমে এবং তৎকালীন কাহিনী-কাব্যসুলভ আড়ম্বরে তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা

অমিয়কুমার মজুমদার

সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুটিকে বিপরীত কোটির মনে করা হতো। এ ধারণার মধ্যে যে ফাঁক রয়ে গেছে তা আজ অনেকের কণ্ঠেই স্বীকৃত হচ্ছে। শিল্প বা কলার যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা বলেন আগে শিল্প পরে বিজ্ঞান। মানুষের জন্মের প্রথম অধ্যায় থেকেই সুরু হয়েছে শিল্পের রথযাত্রা। কালক্রমে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে নানা দিকে, আর বিজ্ঞান তো আধুনিক কালের সৃষ্টি একথা অনেক শিক্ষিতের কণ্ঠে শোনা যায়। নিঃসন্দেহে একটি ভ্রান্তি। বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে যে ইতিহাসের সূচনা হয় তা নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞানের। একথা অনস্বীকার্য যে আদি মানবের শিল্পকলাপ্রীতি যতটা ছিল, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তার চেয়ে কম ছিল বলে মনে হয় না। বরং বিজ্ঞানবুদ্ধি অধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে কাব্যের সুরু হয় প্রকৃতির বন্দনা দিয়ে। শিল্পেরও আরম্ভ সেখানেই। আর ঐ প্রকৃতি-বন্দনার মূলে রয়েছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, কারুশিল্পে বিজ্ঞানের বিপুল প্রভাব দেখে বিস্মিত হই। প্রকৃতপক্ষে এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই, যেহেতু মানুষের আদিমতম যুগ থেকে বিজ্ঞান ও শিল্পের সঙ্গে এক বিচিত্র সখ্যতার বন্ধন চলে আসছে। এই গাঁটছড়াকে আমরা অস্বীকার করে এসেছি, তাই সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের কারুকার্য দেখলে চমকে উঠি। যে সাহিত্যিক বা কবির কৃতকর্ম কালোত্তর, নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে যে তিনি বৈজ্ঞানিকের মত সত্যনিষ্ঠ। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক্। বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো অমর হবার সৌভাগ্য হয়েছে ক'জনার? এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এই যে কবির অন্তরে বিজ্ঞানীর সত্যনিষ্ঠা যতটা ছিল হয়তো অনেকেরই তা ছিল না। তাই তিনি যুগে যুগে বেঁচে থাকবেন মানুষের মনের মণিকোঠায়। আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও এমন একটা যুগ প্রবাহিত হয়ে গেছে যখন দেশের শিল্প-সাহিত্যের কর্মে নিযুক্ত কর্তারা বিজ্ঞানের প্রভাবকে বিন্দুমাত্র স্বীকার করতে অত্যন্ত অনীহা প্রকাশ করতো। আর আমাদের দেশের তো কথাই নেই। সেই কতযুগ আগে ভারতঋষিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দীপশিখা জ্বেলেছিলেন তাকে তেল-সল্‌তে দিয়ে উজ্জ্বলতর করবার কোন প্রচেষ্টা আমরা করিনি, আর তা করিনি বলেই দীর্ঘদিন অজ্ঞানের প্রচ্ছায়াতে নিশ্চেষ্টচিত্তে অলসতার অনুশীলন করে এসেছি। রবীন্দ্রনাথের আগে এমন কোন কবির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে তাঁর চক্ষু উন্মীলন করতে পেরেছিলেন। যে সব কবি-সাহিত্যিকের অন্তর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে আলোকিত হয়নি, তাঁদের রচনাবলী কখনই কালজয়ী হতে পারে নি। অনেক সময়েরই তাঁদের বল্গাহীন কল্পনা উদ্দাম হয়ে বিপথগামী হয়েছে। ইংরেজ-কবি পোপ তাঁর রচনাতে বিজ্ঞান-বিমুখ কবি-সাহিত্যিকদের বিদ্রূপাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছেন।

আর একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে অবৈজ্ঞানিক মন নিয়ে কাব্য রচনা

করলে কোন কবি মহাকবির আসন পেতে পারেন কিনা! যাঁরা মনে করেন কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দিলেই কাব্য হয়, যুক্তিহীন বক্তব্য পেশ করলেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাঁরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন তা অনুমান করা চলে একথা অনেকে বলছেন। অযৌক্তিক কথা, অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য কবির মুখে কখনও মানায় না, মহাকবির পক্ষে তো নয়ই। আমি দুজন বিদেশী মহাকবির নাম তুলে ধরবো। প্রথমজন সেক্সপীয়র, যাঁর চতুর্থ শতবার্ষিকী উৎসব সম্প্রতি বাংলাদেশেও অনুষ্ঠিত হলো, আর একজন হলেন শেলী। দুজনেই তাঁদের যুগের গণ্ডী অতিক্রম করে মহাকালের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। তার মূলে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মন। 'To a Skylark' 'The Cloud' কবিতা যারা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে ঐ অকালজীবী মহাকবির বিজ্ঞান-প্রীতির কথা বিস্তৃতভাবে বলবার প্রয়োজন হবে না। আর, সেক্সপীয়রের কাব্যে ও নাটকে আইন, ডাক্তারী, নৌবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সব কিছুরই ছড়াছড়ি।

কেবলমাত্র আজগুবি কথা বা রসাত্মক বাক্য দিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয় না যা সৃষ্টি হয় তা হলো ফ্যান্সি বা ইমাজিনেশন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের সংজ্ঞা বলেছেন—"রসাত্মক বাক্য যখন সত্যাত্মক হয় তখনই তা সত্যিকারের কাব্য।"

বিজ্ঞানের মধ্যে দুটি স্তর আছে। একটি রূঢ় আর একটি কোমল। প্রথমটি প্রয়োগ বিজ্ঞান তথা যন্ত্রবিজ্ঞান। এর সাহায্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতিবাস্তব প্রয়োজনের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। আর একটি কোমল তথা শৌখিন পর্যায়ের। প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় দাবী মেটাবার দায়মুক্ত হয়ে বিশ্বের অসীম রহস্য উন্মাটনে উন্মুখ। তাঁরা নিঃসন্দেহে কল্পনাপ্রবণ। তা না হলে মহামতি গ্যালিলিও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নক্ষত্রলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন না। নিউটন, গ্যালিলিও, ডালটন, রাদারফোর্ড, হার্টন, ম্যাকস্য়েল, ফ্যারাডে, আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করার অধিকারী সেক্সপীয়র, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ। সকলেই কল্পনারাজ্যের অধিবাসী। বিশ্বরহস্য উন্মোচনে উভয় দলের সত্যনিষ্ঠা সমশ্রেণীর, পার্থক্য কেবলমাত্র প্রয়োগ কর্মে।

বিজ্ঞানের সংগে দর্শনের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান কি না তা নিয়ে প্লেটো, কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজা থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে আসচে। তবে ক্রিনবর্তিতম বয়স্ক দার্শনিক রাসেলের কাছে পৌছে যেন সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 'where science ends, philosopby begins.'—এমনি একটা কথা যে দর্শনের ছাত্র-অধ্যাপকদের কণ্ঠে শ্লাঘা এবং অহমিকার সঙ্গে উচ্চারিত হতো আজ তার রেশ যেন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেচে। যোজনব্যাপী পার্থক্যটা যেন ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এর কারণস্বরূপ বলেছেন "কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে।"

প্রস্তর যুগের শেষাংশে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য গেল অনেক বেড়ে। সর্বক্ষেত্রে বিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল। মিশর, ব্যাবিলন, চীনে বিজ্ঞানের প্রভাবজনিত বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। সভ্যতা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে লাগলো। তাতে স্পর্শ লাগলো গ্রুপদীয়ানার ঔজ্জ্বল্য। বিজ্ঞান ও শিল্প তার উপচ্ছায়াতে পড়ে গেল। গ্রীসে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণা সুরু হলো। ধর্মের, অনুশাসনের

চাপে এখানে বিজ্ঞানের দীপশিখা নিবু নিবু হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কাব্যে সাহিত্যে ঈশ্বরতত্ত্ব, কৌতুক-প্রহসন আর অবাস্তব কল্পনার ছড়াছড়ি ছিল। রবীন্দ্রনাথে পৌছে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে কাব্যে-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের রং ধরলো। আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক আখ্যা দিয়ে থাকেন। এবং রোমান্টিকতার সংগে বিজ্ঞানের চিরন্তনতা বিদ্যমান তা কারো অজানা নেই। হয়তো বা একারণেই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতাকে' কোন আধুনিক সমালোচক 'এ এক আশ্চর্য কবি কল্পনা' বলে কবিকে বিজ্ঞান-বিমুখ আখ্যায় প্রকাশ করবার অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমালোচকের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয় এ ধারণা অভ্রান্ততার পাদদেশ পর্যন্ত পৌছায়নি।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন বা বিজ্ঞানের বই লিখেছেন অথবা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্যই তাঁকে বিজ্ঞানের অনুপন্থী বলছি না, কবির সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম তার প্রমাণ। তিনি পেশায় বিজ্ঞানী নন কিন্তু মেজাজে পুরোপুরি। মানসী কাব্যের মধ্যে কবি যখন পরিপূর্ণ সচেতনভাবে তাকিয়েছেন বিশ্বের দিকে তখন তাকে মনে হয়েছে ভয়ঙ্করী। তারই পর মুহূর্তে 'অহল্যার প্রতি' কবিতার স্নিগ্ধ প্রলেপে চিত্ত শান্ত হয়ে আসে। আগের এক রচনাতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে এই কবিতাটি বিজ্ঞানের মাধ্যাকর্ষণ এবং বিবর্তনবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে জন্ম নিয়েছে।

মানবের সামাজিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের বহু বিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য এবং আরও কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন।"১

১৩৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৬ই জুলাই, ১৯৩৪) কবি এক বক্তৃতায় সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে উদ্ভিদতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন "উদ্ভিদের দুই শ্রেণী ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায় ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ তার দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হোতে হোতে তা লুপ্ত হয়ে যায় ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হোতে হোতে মিলিয়ে যায় না। সে তাল তমালেরই মতো; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। একেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য।"২

প্রায় প্রতি দেশেই মাঝে মাঝে কোন কোন যুগ এমন হঠাৎ এসে পড়ে যখন দেশে উত্তেজনা থাকে প্রচণ্ড হয়ে। দেশের মধ্যে প্রবাহিত সেই উত্তেজনার প্রচণ্ড তরঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রকেও আপ্লুত করে ফেলে তার প্রকৃতিকে করে অভিভূত। যুদ্ধকালীন সময়ে য়ুরোপে যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে,

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। একথা সত্য যে ঐ ভাব চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের দেশেও দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরবর্তী কালে বিস্তর গল্প, উপন্যাস লেখা হলো সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে আশ্রয় ক'রে। আজ ইংলণ্ডের বা ইউরোপের সাহিত্যের মতই এখানেও সেই উত্তেজনার জোয়ার ক্রমশ ভাঁটার দিকে। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে পেশ করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপমার সাহায্যে। তিনি লিখেছেন, "ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল তখনকার সাহিত্য-সূর্য তারি কলঙ্করেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতি সত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।" ৩

সাহিত্য-বিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা-এই প্রসংগে কবি বলেছেন যে প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে কোন জিনিস সংগ্রহ করবার জন্যে এই বিশ্লেষণী পন্থা গ্রহণ হচ্ছে। যে সাহিত্য আলোচিত হতে চলেছে তার উপাদানগুলিই কি বেছে নেবার জন্যে এই প্রচেষ্টা? তাই যদি হয় তবে তার প্রয়োজন নেই। যেহেতু উপাদানসমূহকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। তিনি বলেন যে 'সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।' বিষয়টিকে ভালো করে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন—"প্রচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাঁকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয় কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরাপড়া সত্বেও জোর করে বলতে হবে যে সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেন না উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী··· ॥৪

অনেকের মনে একটা ধারণা দানা বেঁধে আছে যে সাহিত্যে কেবলমাত্র একটি সত্য বর্তমান তা হলো প্রকাশের সত্য অর্থাৎ যা বলতে চাই তা প্রকাশ করবার পন্থাগুলো যদি অযথা হয় তাহলেই তাকে বলা হলো মিথ্যে আর যথাযথ হলেই তাকে বলা হ'লো খাঁটি। একথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের আদি সত্য হচ্ছে তার প্রকাশ। কিভাবে তাকে প্রকাশ করা হলো সেইটেই মূল কথা। কিন্তু তা-ই কি শেষ কথা? এর মীমাংসা করতে গিয়ে কবি জীববিজ্ঞানের তত্ত্বের দোহাই টেনেছেন। বলেছেন, "জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্ছে প্রটোপ্ল্যাজম, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজম্ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ প্রটোপ্ল্যাজমের মধ্যে নেই। এখন, এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজমকে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।" ৫ এটি লোকেন পালিতকে লেখা একটি পত্র থেকে তুলে দেওয়া হলো।

এবার আরো বাস্তবমুখে অবগাহন করা যাক। ভারতের কৃষিসমস্যা চিরন্তন। এই সমস্যার স্বরূপ কবির অজানা ছিল না। চাষের জমির প্রাচুর্য নেই। তাই খাদ্যশস্যের প্রয়োজন মেটাতে হোত জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করে। এই সত্যটিকে তিনি বেঁধে দিলেন কবিতার ছন্দে।

"যাই ফিরে যাই মাটির বুকে যাই চলে যাই মুক্তি সুখে
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে
আজ ধরণী আপন হাতে অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।" (মাটির ডাক)

আমরা মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করি কিন্তু যতটা পরিমাণ খাদ্য মাটির দরকার তাকে তা দেই না। তারই ফলশ্রুতিরূপে কয়েকবার ফসল দেবার পরেই মাটি খাদ্যাভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং সেই সংগে মানুষও খেতে পাচ্ছে না। বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটিই কবি তাঁর এই কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। একই কথা তিনি ১৯৩০ সালে রাশিয়া থেকে ঘুরে আসার পর বলেছেন এক বক্তৃতায় ১৯৩২ সালে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারের গতি চক্রপথে মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। মাটিতে ফসল লাগানো সম্বন্ধে এই চক্রবেখাপূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে।"

কবি এঙ্গেলসের "ডায়ালেকটিস অব নেচার" পড়েন নি। কিন্তু নরবানর থেকে আজকের এই মানুষের রূপান্তর গ্রহণে সামাজিক শ্রমের ভূমিকা সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ যা বলেছেন, কবিও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

"দেহের দিক হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সেইখানে—যেখানে সে দুই পদের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি আহরণ করিল।···দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে।

পায়ের কাছ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তাহলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মত অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাঠির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন এক বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অমরত্বের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানরঙ্গ, আনন্দরঙ্গের রাজ্য।"

বিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে কবি অনেক সময় সমাজের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত নিয়েছেন। পরমাণুর কেন্দ্রের মধ্যে হাঁ-ধর্মী প্রোটন এবং না-ধর্মী নিউট্রনকে যে অতি প্রবল এক শক্তিঘরের বিবাদ মিটিয়ে একসূত্রে বেঁধে রেখে বিশ্বের ভাঙনকে রক্ষা করেছে তা বোঝানোর জন্যে কবি প্রাক্ বিপ্লব মহাচীনের ইতিহাস থেকে উপমা দিয়ে বলেছিলেন "চীন বিপাব্লিকের শান্তি নষ্ট করে কতকগুলি একাধিপত্য-লোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই করে দেশটা ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধ দলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তাহলে শাসনের কাজে এদের সকলকে

এক করে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ ক'রে রাখা সহজ হত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির ওপরে, তাই যারা স্বভাবত মেলে না তারাও মিলে বিশ্বশান্তি রক্ষা হচ্ছে। এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পদার্থটি ভালোমানুষী শান্তি নয়।···যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।"

'রাশিয়ার চিঠিতে বিপ্লবতত্ত্বের ব্যাখ্যা কবি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ভাষায় করেছেন। বলশেভিকবাদের অভ্যুদয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন "বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তদ্বত্ব (depression) ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেশন করে মারমূর্তি ছুটে আসে এও সেই রকম কাণ্ড। মানব সমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব।"

জগতের সমস্ত পদার্থই গতিশীল আর সেই গতির মূলে আছে মহাকর্ষ শক্তি। এ সম্বন্ধে কবি বলছেন "নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।"

বিশ্বপ্রকৃতির চক্রাবর্তন গতি বোঝাবার জন্য কবি যে উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সত্যই অপূর্ব।

"ফুল যখন ফুটিয়া ওঠে মনে হয় ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র সেকথা গোপন থাকে।···আবার ফলকে দেখিলে মনে হয় সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, একথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক মেজাজের একথা বহুবার বলা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক মন গড়ে উঠবার পশ্চাতে ছিল নানা ঐতিহ্য। মানুষের পরে ঐতিহ্য (Heridity) এবং পরিবেশের (Circumstance) প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তা বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভের বস্তুবাদী মতকে সমর্থন করে। কবি বলেছেন "একটি মানুষের মনের পিছনে আছে অসংখ্য সংস্কার বংশগত সমাজগত জাতিগত ভাষাগত বিচিত্র উপাদানে গঠিত তিনি। জৈব ও ঐতিহাসিক সামাজিক ও ভৌমলিক বিভিন্ন কার্যকারণ পরম্পরা গঠিত মানবের এই দেহ ও মন। তাহার ব্যক্তিত্বরূপ সৃজিত হইতেছে এই বিচিত্র উপকরণের ঘাত প্রতিঘাতে। এই সবের ভার মানুষ যুগযুগান্ত ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে এবং পারিপার্শ্বিকের নিত্য প্রভাব ও সাহচর্য নব নব পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া মানুষকে জটিল জীবরূপে গড়িতেছে।

কবি হয়তো আদর্শবাদী ছিলেন কিন্তু তার আদর্শবাদ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে নয় বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা করে নয় তিনি বলেছেন, "সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ সেই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ।···সৃষ্টের উপরে অসৃষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক।···ব্যক্তের বীণাযন্ত্রে আপন বাণী পাঠায় অব্যক্ত।···সংসারের নিয়মকে জেনেছি—মূঢ়ের মত তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন মুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে।"

তাহলে একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে কবির আদর্শবাদ বস্তুবাদকে উপেক্ষা করে নয়, বরং তাকে স্বীকার করেই। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে উপলব্ধি করবার প্রচেষ্টা তাঁর আবাল্য।

কলা ও বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ হলে (এলিয়টের ভাষায় সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ) বিজ্ঞানের ক্ষতির দিকটা তত বেশী ভারী হয়ে উঠবে না ; কলা শিল্পও বেঁচে থাকবে তবে তা হয়তো শিল্পনামধারী কারুকাজকরা কবরে।

বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র নয়, ভারতীয় সাহিত্যেও খুব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ-ই একমাত্র শিল্পী যার মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত এবং যিনি কাল্পনিক সংগতিকে উপেক্ষা করে অসংগতির সৌন্দর্য'কে উপলব্ধি করেছেন যথার্থভাবে। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন "·····এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে·····তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারেনি আমার মনে কোন পৌরাণিক বিশ্বাস, কোন বিশেষ পার্বণবিধি।·····তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরে স্থান দিতে চেয়েছি।"

তথ্যপঞ্জী :

(১) সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে (১৩৪৪) পৃঃ ৬২ (২) প্রবন্ধ, ভাদ্র ১৩৪১ (৩) 'সাহিত্য-ধর্ম' বিচিত্রা শ্রাবণ ১৩৩৪ (৪) সাহিত্যবিচার প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৬ (৫) লোকেন পালিতকে পত্র। সাধনা—১২৯৯।

ঘেঁটু ঠাকুর ও ঘেঁটু গান

নারায়ণ দত্ত

আজ কার দেবকুলে ঘেঁটুঠাকুরের কোন কৌলিন্য নেই। সে নিতান্তই গ্রাম্যদেবতা। চর্মরোগ পীড়িত আর্ত মানবকে ত্রাণ করাই তার দেবধর্ম। তবে মনসা, চণ্ডী, যষ্ঠী, ওলাবিবি, শীতলা, বনদুর্গা প্রভৃতি লৌকিক দেবীদের মত দাপট তার নেই। পুরুষ দেবতা বলেই বোধ হয় গ্রামে ঘরে তার বোল বোলা কম। বার মাস পূজা পাবার ভাগ্যও তার নয়। ঘেঁটু মর্তধামে বছরে একদিনের জন্যে আসে। সেদিনই তার পূজা। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদায়। তার পূজা বা বিসর্জনের ঘটা দেখলে দেবতার ওপর করুণা হয়।

ফাল্গুনের দিন ফুরিয়ে আসে আর চৈত্রের খরা সুরু হয়, ফাল্গুনের সেই শেষ দিনটিতে বাঙলার গ্রামে ঘরে ঘেঁটু ঠাকুরের পূজা হয়। ফাল্গুন সংক্রান্তির অন্য নাম তাই ঘেঁটু সংক্রান্তি। ঘেঁটুর পোষাকী নাম ঘন্টাকর্ণ। ঘেঁটুর শাস্ত্রসম্মত কোন ধ্যানমূর্তি নেই। কিন্তু পূজার মন্ত্র আছে। মন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঘন্টাকর্ণকে মহাবীর বলে তার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

ঘন্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশক।
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥

এই মন্ত্র রঘুনন্দনের তিথ্যাদিতত্ত্ব অনুসারে। মন্ত্রের ব্যবস্থা থাকলেও মন্ত্রানুযায়ী ঘেঁটুপূজা বড় একটা দেখা যায় না। পূজা অবশ্য হয়। কিন্তু সে পূজার কোন ঘটা নেই। পূজা করে বাড়ীর মেয়েরা। দেবতার মূর্তিও ভিন্ন। সাধারণত একদম কাক-ডাকা ভোরে বাড়ীর দরজায় বা রাস্তার তেমাথার মোড়ে মেয়েরা এই পূজা করে থাকে। মুড়ি-ভাজা খোলার ভাঙা কালি-পড়া টুকরোর ওপর এক তাল গোবর রেখে তাতে দুটো কানাকড়ি বসান হয়। তারপর আকাঁড়া চাল আর মুসুর ডালের নৈবেদ্য সাজিয়ে ঘেঁটু ফুল আর অশোক ফুলে ঘেঁটু ঠাকুরের পূজা করা হয়। পূজার শেষ হতে যা দেরী, লাঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘেঁটুকে ভেঙে ফেলা হয় যারা ভাঙে তারা কদাচ ঘেঁটুর দিকে তাকায় না। পাছে দেবতার কোপ পড়ে। গ্রাম্য কবি ঘেঁটু ঠাকুরের রূপ বর্ণনা করেছেন—

রূপটি তোমার কেলে হাঁড়ি — চক্ষু দু'টি কাণা কড়ি
মাথাতে গোবরের মুড়ি — আহা মরি, কি গঠন!

পাঁচালীকারদের উত্তরসূরী কবি স্বভাবতঃই পূজার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন—

ঘেঁটুফুল আর অশোক ফুলে — প্রতি দ্বারে দ্বারে তোমা
আকাঁড়া চাল আর মসুর ডালে — পুজে যত নারীগণ।

ঘেঁটু কুলীন দেবতা না হতে পারে কিন্তু, বোধকরি নিতান্ত অর্বাচীন নয়। শীতলার অঙ্গদেবতা হিসেবে ঘেঁটু পূজার বিধি আছে। মহামারীর সময় শীতলা পূজা হলে ঘেঁটুরও একটা নৈবেদ্য মেলে। মুখ্যতঃ চর্মরোগের দেবতা হলেও মনে হয় এককালে ঘেঁটু বসন্ত রোগেরও ত্রাতা হিসাবে পূজা পেত। যে মন্ত্র পড়ে মেয়েরা আজকাল ঘেঁটুর পূজা করে তাতেও সেই ইঙ্গিত আছে।

মন্ত্রটি বিচিত্র— হামবসন্ত নিয়ে ঘেঁটু ভাঁটে উলে যাও।
পানবসন্ত নিয়ে ঘেঁটু ভাঁটে উলে যাও।
খোসচুলকানি নিয়ে ঘেঁটু ভাঁটে উলে যাও।

সংস্কৃত মন্ত্রে যে বিস্ফোটকের উল্লেখ আছে সেটা সম্ভবতঃ বসন্ত। ঘেঁটুগান মুখ্যতঃ ঘেঁটুঠাকুরের গান। দেবতার মত এই গানেরও কোন কৌলিন্য নেই। গানগুলি নিতান্তই লোকসংগীত। এক ধরণের মঙ্গলগান। তবে সেগুলিতে দেববন্দনা বা দেবতার মাহাত্ম্য। কীর্তনের চেয়ে দেবতাকে নিয়ে লঘু পরিহাসের ঝোঁকই বেশী। কোন ধ্রুপদী মহত্ত্ব সেগুলিতে আবিষ্কার করার চেষ্টা বৃথা। গান হিসাবে তাদের মূল্য সামান্য।

অনেকে মনে করেন ঘেঁটুগান আর যাই হোক গান নয়। হয়ত তাই। কিন্তু গ্রামের মানুষদের কাছে তাদের আদর কম নয়। ঘেঁটুগানের কল্যাণে তাদের প্রায়-শুষ্ক প্রাণনদীর বুকে অন্ততঃ এক রাত্রির জন্য আনন্দের জোয়ার আসে। ঘেঁটুগানের সেইটুকুই সান্ত্বনা।

ঘেঁটুপূজার চেয়ে ঘেঁটুগানের জমজমাট বেশী। ঘেঁটুঠাকুরকে স্মরণ করে ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যার বিচিত্র ছড়া ও গানের বেশ সমারোহ হয়। গায়কদের কাঁধে থাকে কলার বাসনা ভাঁজ করে তৈরী একটা লণ্ঠন। ভিতরে টিম টিম করে অহুজল প্রদীপ। কেউ কেউ বা হ্যারিকেন ব্যবহার করে। কিন্তু সস্তাফোটা বর্ণসংকর ঘেঁটুফুলের রাশি দিয়ে আলো সাজাতে কেউ ভোলে না। বাংলাদেশের আঙিনায় নিতান্ত অযত্নে ফোটা প্রকৃতির এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য এই একটি দিনের জন্য জাতে ওঠে। এই কদরের কারণ আছে। ঘেঁটুফুলে আলো না সাজালে গৃহস্থের পূজা মেলা ভার ঘেঁটুফুলের সেদিন তাই ভিন্ন মর্যাদা।

এই ঘেঁটুফুলে সাজান লণ্ঠনটি কাঁধে করে ছেলে-বুড়োর ছোট-বড় দল বাড়ী বাড়ী ছড়া কেটে বা গান গেয়ে ঘেঁটুর পূজা চেয়ে বেড়ায়। এই ছড়াগুলির বাণী যেমন বিচিত্র তেমনি রহস্যজনক। সব ছড়াই সুরু হয়—ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় খোস পালায়। তারপর বলা হয় 'আয়রে ঘেঁটু নড়ে, হস্তী কাঁধে করে'। সংস্কৃত মন্ত্রে ঘেঁটুকে যে মহাবীর বলা হয়েছে, তার একটা নজীর পাওয়া গেল। মহাবীর ঘেঁটু হাতিকে কাঁধে করে আনবে এ আর আশ্চর্য কি? তারপর গাওয়া হয়—

'ফাল্গুন গিয়ে চৈতের কোল।
বছর বছর গেয়ে তোল ॥'

ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যায় গান গেয়ে দেবতাকে বিদায় দিতে হয়, কবির বক্তব্য বোধ হয় তাই। তারপর অন্যান্য ছড়ায় থাকে পূজার অনুপাতে দেবতার রূপাবৃত্তির দীর্ঘ ফিরিস্তি—

'যে দেবে মুঠো মুটো। — যে দেবে বাটি বাটি।
তার হবে হাত ঠুটো ॥ — তার হবে চালতাগা'টি ॥
(রূপণতার সাজা আর কি!) — (মশুন নিবোগ গাত্র)
যে দেবে কাঠা কাঠা। — যে দেবে মরাই মরাই।
তার হবে সাত ব্যাটা! — তার ছুয়ারে ঘেঁটু ছড়াই ॥ ইত্যাদি।

গায়কদের সঙ্গে ঘেঁটুফুলে সাজান আলো না থাকলে গৃহস্থের পূজা পাওয়া শক্ত। কিন্তু ঘেঁটুফুল

বাড়ীতে ফেলে গেলে গৃহস্থের বড় অকল্যাণ হয়। গ্রামীণ সংস্কার অন্ততঃ তাই। শেষ ছড়াতে সেই ভয় দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে, ঘেঁটুরাজ লোভী নন। মরাই বা গোলা প্রমাণ চালের পূজা তিনি গ্রহণ করেন না। জানি না এ ছড়ার রচয়িতা কোন প্রাচীন কবি, কিন্তু তিনি যে যথেষ্ট ‘প্রাকটিক্যাল’ ছিলেন সন্দেহ নেই। মরাই মরাই চালের পূজা কোন গৃহস্থই যখন দেবে না তখন নির্লোভ ঔদার্য একটু দেখালেই বা ক্ষতি কি। দেবতার যত দোষই থাক, দেবতা যে লোভী নন, তার একটা বড় প্রমাণ ত রয়ে গেল।

ঘেঁটু পূজায় ছড়া ছাড়াও অনেক গান বাঁধা হয়ে থাকে। রীতিমত দল বেঁধে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাওয়া হয়। এমনি একটি গান—

‘ও সজনি, খোস চুলকানি বিষম দায়   খোসের জালা যায় না সওয়া
মরি, হায় গো হায়।   পিরীত জালা সওয়া যায়।
মরি, হায় গো হায়॥

খোস চুলকানির জালায় পারিবারিক অবস্থা কি কৌতুককর হয় তার গ্রাম্য বর্ণনা আছে—

ঘেঁটুর পূজা দাওগো জননী।   গিন্নী মরে খোসেরজালায়
কোথায় গেলে ও বাড়ীর গিন্নী॥   চুলকে চুলকে কর্তা হাঁপায়
পূজা দেবার লোক যে মেলেনি॥
ঘেঁটুর পূজা…………ইত্যাদি।

সব গানেই ঘেঁটুকে কিছু না কিছু রসিকতা করা হয়েছে এবং সব সময় যে শালীনতা বজায় রাখা হয় এমন নয়। ঘেঁটু যেদিন আসে সেদিনই বিদেয় নেয়। কবির কাছে মনে হয়েছে তার আদর যেন মৃত কন্যা মাতার কাছে জামাই-এর আদর। কবি বলেছেন—

‘ওগো আমার কেলে জামাই   পিঁড়ে আমার বাপের বাড়ী
তোমায় আমি কোথায় বসাই   মানে মানে হও বিদেয়।’

ঘেঁটুর বাসর-ঘর কুৎসিতরূপ ঐ সব নিয়েও কবির ব্যঙ্গ রসিকতার অন্ত নেই।

ঘেঁটু-সংক্রান্তির গানের দেবতা-নিরপেক্ষ অন্য একটা ভূমিকাও থাকতে পারে। ফাল্গুন কুসুমের মাস। আবার আনন্দের সময়। তার সাজি ভরে থাকে নূতন জাগা কিশলয়ে, পলাশ আর আর কিংশুকের অপর্যাপ্ত বর্ণ-সম্ভারে। তা’ ছাড়া, এ সময় সদ্য-ওঠা ফসলের পরম পরিতৃপ্তিতে বাঙলার চাষীমন জুড়ে এক অনির্বচনীয় শান্তি আশ্রয় করে। তাই কুসুমের এই মাসকে বিদায় দেবার জন্যে গ্রাম বাঙলা সামান্য জলসার আয়োজন করে। গানের আসর বসায়। ঘেঁটু সংক্রান্তির গানে তার সানন্দ মনখানি।

ঘেঁটু গানের আয়ু আর কতকাল, কে জানে। তবু আজও, ফাল্গুন সংক্রান্তির সন্ধ্যায় শাঁখ বেজে ওঠবার আগেই গ্রামের বাতাস এই বিচিত্র গানের সুরে ভারী হয়ে ওঠে। তারপর রাত গভীর হয়। পূব আকাশের সাত-তারা মাঝ আকাশে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রামের শেষ প্রান্তে শিয়ালগুলো হঠাৎ আনমনে ডেকে ওঠে আর ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যায় ছোট-বড় গলায় ঘেঁটুর গান ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে একেবারে থেমে যায়। ফাল্গুন শেষ হয়। চৈত্র এসে পড়ে।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

শিল্পে আবেগ

বাইরের জগৎ নানান রূপে রসে মশগুল হয়ে আমাদের ভেতরকার রঙমহালে এসে হাজির হয়; তার সেই জামদানী বিলাস আর জাফরানী জলুস দেখে মনের চোখে ভাব লাগে। একেই বলি আবেগ। এমনি করে ছোটো ছোটো ঘটনা টুকরো টুকরো ছবি কিংবা কাটাছেঁড়া জিনিসের অফুরন্ত মিছিল চলেছে সদর থেকে অন্দরের দিকে। চলতে চলতে অনেক দেউড়ি পেরিয়ে একসময় এ মিছিল অনুভূতির উজান হয়ে ওঠে অমনি আবেগ জাগে উজানের এপারে ওপারে। যে-কোনো আবেগই অগুণতি দোলনের যোগফল। তবে সব রকমের দোলন সকল ছাঁদের আবেগ জাগাতে পারে না—এ কথা জীবনের পথ-চলাতে যেমন সত্যি তেমনি শিল্পের কারুশালাতেও। আবেগমাত্রই বাঁধা পরিবেশের সাথে জোড়মেলানো। শিল্পীর ক্ষমতারও একই হাল। ইচ্ছেমত রসিকমনে আবেগের ঢেউ তোলার ব্যাপারটা পুরোপুরি তাঁর হাতের মুঠোয় নেই। কারণ কারুকাজের কোনো বিষয় শিল্পীর একই আবহাওয়ায় পুষ্ট রসিকমনে সমান আবেগের মাতন লাগলেও ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন অভিজ্ঞতায় গড়েওঠা রসিকমনের আওতায় তা এমনিধারা অঙ্কমাফিক দুয়ে দুয়ে চার না ঘটাতেও পারে, সেখানে শিল্পীর আবেগের সাথে ঐ বেএক্তিয়ার রসিকমনের আবেগের অমিল হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়।

সাবেক আমলে শিল্পের লক্ষ্যই ছিল শিল্পীমনের আবেগকে ছোঁয়াচে করে তোলা যাতে তা সহজে রসিকমনে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন শিল্পের নজর থাকত আবেগকে জীবনের ছলছুতো খেয়োখেয়ি থেকে মুক্ত করে ওপর কোঠায় নিয়ে যাবার দিকে, মানে—তাকে একটা দরাজ শরীফানায় পৌছে দেবার দিকে। এ ধরণের আবেগ সরাসরি জগতের রূপ-রস থেকে আসে না, আসে বাইরের জগতের রূপ-রসকে ঘিরে শিল্পীমনের বুঁদ হওয়া ভাবনার সড়ক বেয়ে। অবশ্য কালবদলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আর যুক্তির ঝাঁঝালো স্বাদে আবেগের ঐ উঁচুতলায় শরীফানা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এক সময় বেমালুম মুছে গিয়েছে। তাই আজ আমরা আবেগকে নিয়ে একেবারে নীচের মহলে নেমে এসেছি এঁদো জীবনের পাঁচরঙে আরো বেশি করে মাতাল হতে।

যখন আবেগ প্রকাশ করি তখন একটু আমরা তলিয়ে দেখিনে যে, আবেগ প্রকাশ করা মানে হচ্ছে, প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আবেগগুলোকে মাত্রায় বেঁধে দেওয়া, মেজাজের সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়ার মিতালি গড়ে তোলা। আবেগ যদি প্রকাশ করা না যায় তবে মনের দশা হবে মাঝদরিয়ায় ঝড়-বাদলে দিশেহারা জাহাজের মতো। তাই পরের দুখে কেঁদেও আমরা সুখ পাই, নিজের দুঃখ পরকে জানিয়েও। কারণ কিছুটা আবেগ বাইরে মেলে দেবার ফলে তোলপাড় ভাবটা যখন কেটে যায় তখনই আমাদের ভেতরমহল হাঁপ ছাড়ে। এমনিধারা পরের ব্যথাকে নিজের করে নিয়ে আর নিজের ব্যথাকে সবাইকার করে তুলে শিল্পের সাঁকো বেয়ে মন একটা খোলা

আঙিনায় খালাস পায়। দেখতে দেখতে আনন্দের আলোয় আমরা ভরে ওঠি। তাহলে এটুকু বোঝা গেল, দুঃখের গভীর থেকে আবেগ বেদনাকরুণ হয়ে এলেও শিল্প তাকে চোলাই করে আনন্দকে খুঁজে নেবেই। আর আবেগের প্রকাশেই যে এই আনন্দের গোড়াপত্তন তার বড়ো নজির হচ্ছে বর্ষারাতের কানাড়া, যজ্ঞের বিলাপগাথা, যিশুর করুণ মৃত্যুর নিচে মেরির ব্যাকুল ছবি।

এখন, আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে আবেগের চেয়ে প্রকাশের ওপর জোর দিলে শিল্প অনেক সময় অবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই আবেগপ্রবণতা একই সাথে শিল্পের গুণ এবং দোষ। গুণ একারণে যে, শিল্পীমনের ঢেউ-জাগানো আবেগের পুরো চেহারাটিই এ ধরণের শিল্পে রেখায় রেখায় ধরা পড়ে, কোন ফাঁকফোকর দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবার জো নেই। আর দোষ বলছি এজন্যে যে, কোনো একটা আবেগের পুরো চেহারা ফুটিয়ে তোলার দিকে বড়ো বেশি মেতে উঠে আর পাঁচটা আবেগকে, সে সঙ্গে কারুকাজের উপযোগী শিল্পের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে হাতের-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা করে শিল্পীমন গোটা শিল্পটাকে কাঁচিয়ে ফেলে। কাজেই আবেগকেও পুরোপুরি রাখব অথচ শিল্পকেও নষ্টচাঁদের কোপে পড়তে দেব না—এই যদি অবস্থা দাঁড়ায়, তখন একই সময়ে প্রকাশের ওপর জোর রাখা আর আবেগের ওপর নজর রাখাই এলেমদার শিল্পীর কাজ।

পয়লা নম্বরের শিল্পীমনের এমন একটা-সকল ছোঁয়া দরদ থাকে যা আশেপাশের হাজার মানুষের গোপনচারী আবেগগুলোকে সহজেই আঁচ করতে পারে। তারপর সেই কুড়িয়ে পেয়ে ডালি-ভরানো আবেগের ওপরেই চলে তার মুন্সিয়ানা। ফলে, অনেক আবেগের যোগে শিল্প হয় বেগবান। কিন্তু যে-শিল্পী অমনিধারা দরদের পরোয়া না করে শুধু নিজের আবেগেই রূপ গড়েন কারুশালায়, শিল্প তাঁর একচেটে রসদে রঙমশাল হয়ে ওঠে। এ হেন মশালমার্কা শিল্প দিয়ে নওরোজের রোশনাই সাজানো যায়, ঘরে পিদিমের অভাব দূর করা যায় না।

আমরা অনেক সময় জীবনকে আবেগ দিয়ে দেখি, ভাবনা দিয়ে দেখি নে। এ দেখার একটা বড়ো বিপদ হচ্ছে এই যে আবেগের বশে কখনো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে জীবনকে জড়িয়ে ধরি, কখনো বা দুঃখে হতাশায় নুয়ে পরে জীবনের কাছ থেকে পালাতে চাই আত্মঘাতী হব বলে। কিন্তু শিল্পের বনেদটি যদি পাকাপোক্ত না হয় তবে সে তো ভাবের এমনিধারা আচমকা পালা বদলে বেসামাল হয়ে ওঠে। তাই শিল্পের হাতে জীবনের সেই আসল রূপটিকে তুলে দিতে হবে যা নিছক সত্যের দামে কেনা, আবেগের চড়া পালিশে যা বহুরূপী নয়। তখনই ভাবনার দরকার। কারণ হেসে-কেঁদে-ভাসিয়ে দেওয়া আবেগের অগোছালো ধারাগুলো ভাবনার নিপুণ হাত বেয়ে পাড়ি জমালেই শিল্পের স্বপ্নসফল সাগরমেলাকে পাবে। নইলে নিজের উচ্ছ্বাসে দিনকানা রাতকানা হয়ে এলোমেলো ঘুরে একদিন হারিয়ে যাবে আড়ালে।

এখন আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে, শিল্পের সওদাগিরিতে আবেগের কী দাম। ধরা যাক, আমরা যদি ভাবগুলোকে নিয়ে ইচ্ছেমতো আবোল-তাবোল খেলা খেলতে থাকি, কিংবা কারুশালায় খেয়ালমাফিক উদ্ভলে-ওঠা রসের মজলিস বসিয়ে দিই, তবে আবেগের কি কিছুই করবার নেই! নিশ্চয়ই আছে। আবেগ তখন হাজার ভাবনার ভেতরে একটা বনিবনা গড়ে তুলতে পারে, কিংবা হাসি-কান্না আশা-বেদনার যে-কোনো একটা ঢেউকে জোরালো করে তুলে আমাদের

ভুলে যাওয়া পথটাকে নোতুন করে বাতলে দিতে পারে। নইলে আবেগ ঝিমিয়ে পড়লেই কল্পনার গোঁজামিল দিয়ে শিল্পে আমরা ফাঁকির পসরা সাজাব। কারণ জগতের মাঠে ঘাটে ঘুরে ফিরে আমরা আবেগকে মুঠোয় পুরি, অথচ সেই আবেগের ভেতর দিয়েই ছুঁয়ে ফেলি জগতের পরম সত্যকে। শিল্পের কারিগরি তাই যতটা ভর দিয়েছে ভাবের ওপর, তার চেয়ে আবেগের ওপর ভরসা করে রয়েছে বেশি।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে-শিল্পী খুনীর চরিত্র আঁকেন, তিনি জীবনে কোনোদিন নিজের হাতে খুন না করেও খুন করবার ঐ তেজী আবেগগুলোকে কোথা থেকে জোগাড় করেন! আমার মনে হয়, শিল্পীর কাজ এখানে শুধু জোড়া দেওয়া। কারণ ঈর্ষায় বিষিয়ে ওঠা, হিংসেয় জলতে থাকা, হতাশায় ভেঙে পড়া, অপমানের লাগসই বদলা নেবার আক্রোশে গুমরে মরা—এমনিধারা আবেগই মনের ভেতরে খুনের ইচ্ছে জাগায়। সংসারে পাঁচজনের সাথে চলাফেরা করতে গিয়ে কোনো-না-কোনো ব্যাপার থেকে আলাদা-আলাদাভাবে ঐ সব আবেগ শিল্পী ভেতরমহলে জমিয়ে রাখেন। এখন, খুন করবার ঠিক আগের মুহূর্তে খুনীর যে-মনোভাব থাকে সেটি সাঁচ্চাভাবে গড়তে গেলে শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে আবেগগুলোকে জোড়া দিতে সুরু করেন; অবশ্য এ জায়গায় কল্পনার রঙ লাগিয়ে তিনি আবেগের মাত্রা কিছু চড়িয়ে দেন। ফলে, ঐ চড়া আবেগের যোগফলে যা পাই তা হচ্ছে একটি খুনীর চরিত্র।

সব আবেগই শিল্পে এসে প্রতিমার রূপ নেয়। তখন তাদের মানে খুঁজে বের করতে মাথা খাটাবার দরকার পড়ে! কাজেই শিল্প শুধু আবেগ নয়, শুধু প্রতিমা নয়, কিংবা দুয়ের জরাসন্ধও একে বলতে পারি নে। শিল্প হচ্ছে আবেগের অতল-ছোঁয়া ভাবনা। আবেগকে যখন শিল্পের বিষয় করা হোলো তখনই তার আর ভালো-মন্দ রইলো না, বিশেষ মন থেকে উঠে এলেও বিশেষ মনের ছাপ সে হারালো, একটা সত্যিকারের ঘটনার গতিকে বয়ে নিয়ে যাবার, যাচনদার হয়ে কোনো কিছুকে পরখ করবার ওপর উঠে গেল। সে তখন পটে-লেখা প্রতিমার রূপ নিয়ে ঠাঁই পেল শিল্পের আসনে।

আবেগ এমন একটা জিনিস যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যাকে বুঝতে পারি, কিন্তু বুঝিয়ে দিতে পারি নে। শিল্প আমাদের মনে বিশেষ কোনো আবেগ জাগিয়ে তোলে—তার মানে এই নয় যে, ঐ আবেগটি শিল্পের মাঝে সাজানো ছিল। আসলে আমার আবেগ আছে আমারই ভেতরে, শিল্প শুধু সেই আবেগের দেরাজ খুলবার চাবিকাঠিটি নিয়ে এসেছে। এমনিধারা আবেগকে ব্যাখ্যা করে কেউ যদি বুঝিয়ে দেবার কাজে লাগেন তবে বোঝা যে গেল না এইটেই বেশি করে বুঝে নিই। যে মালকোশ চেয়েছিল তাকে তালশাঁস এগিয়ে দিলে তার উদর ভরে, হৃদয় ভরে না। আবেগের ব্যাখ্যা শুনেও তেমনি লাভের আঁক কষে কষে জ্ঞানের কোঠা বোঝাই হতে পারে, কিন্তু আনন্দের রসখোলাতে জিরেন-কাট একেবারে বন্ধ। কারণ আবেগের জোড় লাগিয়েই শিল্পের কারুকাজে একটা মেজাজ ফুটিয়ে তোলা হয়। আবেগকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ঐ জোড়ের জায়গাগুলোয় যা লাগে। ফলে গোটা মেজাজটা এবং সে সঙ্গে পুরো শিল্পটাই বেলোয়ারী ঝাড়ের মতো ছড়িয়ে পরে হাজারখানা হয়ে।

দেবব্রত চক্রবর্তী

ছোট গল্প অধ্যয়নের গোড়ার কথা

আধুনিক সাহিত্যের আসরে ছোটগল্পের স্থান আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তার এই দৃঢ় প্রতিষ্ঠার মূলে আছে প্রধানতঃ আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালীর দ্রুতগতি। জীবনযাত্রার দ্রুতি-হেতু এযুগের অনেক মানুষেরই বিরল পরিসরের গল্প উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করবার অবসর বা ধৈর্য নেই। তাঁদের কাছে একটি বড়গল্প বা উপন্যাস অপেক্ষা একখণ্ড সাময়িক পত্রিকার আকর্ষণ অনেক বেশি। এই কারণে বর্তমানে সাময়িক পত্রপত্রিকার এতো চলন; এই কারণেই ছোট গল্প আজকের পাঠকদের কাছে এতো অধিক সমাদৃত!

তবে, একটা কথা। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ছোটগল্প উপন্যাসের আসর দখল করে নেবে। কিন্তু এরকমটি ঘটবার সত্যিই কি কোন সম্ভাবনা আছে? প্রকৃতপক্ষে মনোযোগের সঙ্গে উপন্যাস ও ছোটগল্পের মূলতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে যাঁরা ছোটগল্পের মধ্যে উপন্যাস বিলীন হওয়ার কথা চিন্তা করেন, তাঁরা উপন্যাস ও ছোটগল্পের মূলকথাটিই জানেন না।

উপন্যাসে মানুষের সমগ্র জীবনটি তার জটিলতা এবং তার বৈচিত্র্য নিয়ে চিত্রিত হয়; অন্যদিকে ছোটগল্পে জীবনের মাত্র একটি বিশেষ দিক বা ঘটনাকেই রূপায়িত করা হয়। ছোটগল্পে উপন্যাসের মতো ব্যাপকতা নেই। উপন্যাসে চরিত্র এবং কাহিনী বিশ্লেষণের বা তার খুঁটানুপুঙ্খ চিত্রণের যে ক্ষেত্র রয়েছে ছোটগল্পে তার সম্পূর্ণ অভাব। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে উপন্যাস এবং ছোটগল্প হচ্ছে সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি আঙ্গিক; দুইয়ের ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব স্বাভাবিক কারণেই এই দুইয়ের একে অন্যের স্থান দখল করতে পারে না। সুতরাং এরা উভয়ে উভয়ের প্রতিযোগী নয়, উভয়ে একই গদ্য সাহিত্যের ভিন্ন রূপ।

অবশ্য এটা ঠিক যে, বর্ত্তমান জীবনযাত্রা প্রণালীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যহেতু পাঠকমহল ছোটগল্পের প্রতি অতি মাত্রায় আগ্রহান্বিত।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এডগার এ্যালেন পো বলেছেন যে, আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা দু'ঘণ্টা পড়তে লাগে এমন বর্ণনাত্মক গদ্যই হচ্ছে ছোটগল্প। অর্থাৎ এডগার পো ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে তার দৈর্ঘের দিকেই সবিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, পরিমাণ ব্যতীত উদ্দেশ্য, আর্থিক, এবং গঠনের দিক থেকেও উপন্যাসের থেকে ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

সেই স্বাতন্ত্র্যের প্রথম সূত্র হচ্ছে যে একটি ছোটগল্পে মাত্র একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, এবং তা সীমিত থাকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে; আর, সেই বিশেষ পরিসরের কাঠামোর

মধ্যেই লেখকের বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে সরলতল ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, একটি ছোটগল্পের উদ্দিষ্টকাল মাত্র একটি ঘটনা বা একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেই হবে। বিপরীতক্রমে, ক্ষেত্রবিশেষে একটি ছোটগল্পের আয়তন একটি উপাখ্যানের আয়তনের চেয়ে অল্পবিস্তর বড়হয়েও সার্থকছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃতিপাওয়া অস্বাভাবিক নয়, অবশ্য যদি লেখকের মুন্সীয়ানা থাকে।

ছোটগল্পের রচনাকৌশল সম্পর্কে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে 'ঐক্য';—অভিপ্রায় (of motive), লক্ষ্য (of purpose), রূপদানের (of action) ঐক্য এবং তারও পরে আছে—ফলাফলের দিক থেকে—পাঠকের মনের ওপর ঐ গল্পের প্রভাবের ঐক্য (unity of impression) এই কারণেই ছোটগল্প থাকে একটিমাত্র 'আইডিয়া' এবং সেই আইডিয়াটি রূপায়িত করা হয় বিশেষ একটী ক্রম (method) অনুযায়ী বিশেষ একটী লক্ষ্যকে অনুসরণ করে। এইখানে ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য লক্ষিতব্য। এতো বেশি কাহিনী বা ঘটনার টানাপোড়েনে উপন্যাস রচিত হয় যে অনেক সময়ে তার মধ্য থেকে কেন্দ্রগত কাহিনী বা ঘটনাকে সন্ধান করা যায় না; এবং অনেক সময় বিশ্লেষণের ফলে একটি উপন্যাসে দুই বা ততোধিক ভিন্নমুখী লক্ষ্যের অস্তিত্ব দেখা যায়। পক্ষান্তরে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এমনতর ব্যাপার মোটেই বিধিসঙ্গত নয়। ছোটগল্পের মূলগতআইডিয়া, তার লক্ষ্য, এবং তার রূপায়ণপদ্ধতির মধ্যে কোনরকম জটিলতার স্থান নেই।

এই কারণে ছোটগল্প রচনায় যথেষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন। ছোটগল্পে ব্যবহৃত একটী বাক্যের ওজন যথাযোগ্য হওয়া দরকার; প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, যে কোন উপায়েই হোক, পূর্বপরিকল্পিত নক্সার রূপদানে ব্যাঘাতকারী কোন একটীমাত্র শব্দের ব্যবহারও ছোটগল্পে স্থান পেতে পারে না। ছোটগল্পে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে অনাবশ্যক কোন বক্তব্যের স্থান নেই, যেখানে-সেখানে গুরুত্ব আরোপ করবার অধিকার নেই, এবং এর প্রতিটী পৃথক অংশকে অতি অবশ্যই সমগ্রের অধীনে রাখতে হয়। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমনতর কঠিন নিয়মের বাঁধাবাঁধি নেই। উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরের মধ্যে অনেক পরিহার্য এবং অনাবশ্যক জিনিষ অনায়াসেই স্থান পেয়ে যায়। কিন্তু অল্প আয়তন বিশিষ্ট ঘনসংবদ্ধ ছোটগল্প রচনাকালে তার ছোটখাট প্রতিটী অংশের প্রতি সমানভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। আর ঠিক এই জন্যেই উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের রচনাকৌশলের সামান্যমাত্র ত্রুটীও অনুসন্ধানী-দৃষ্টিতে অত্যন্ত বেশি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অন্যদিকে, উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের সহজগ্রাহ্যতা পাঠকের মনে একটা পূর্ণ তৃপ্তির ভাব এনে দেবার ক্ষমতা রাখে।

সর্বশেষে ছোটগল্পের রসিক সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি যে, অন্যান্য সকল প্রকার শিল্প-রচনা কৌশলের সার্থকতা বিচারের মতো ছোটগল্পের রচনাকৌশল বিচারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে, এর সার্থকতা এবং সফলতার বিচার করতে গেলে সমালোচকের পক্ষে, এতক্ষণ ধরে আলোচিত, পুঁথিগত নিয়মকানুনের (abstract rules) কড়া বাঁধনের স্মরণ নেওয়া অপেক্ষা সমালোচ্য গল্পের সমগ্র নক্সা এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী তার বিচারে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

গীতা পাল

সমালোচনা

রূপদর্শিকা ॥—অসিতকুমার হালদার। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য ১০৲

আচার্য অসিতকুমার আজ পরলোকে। বোধকরি জীবদ্দশায় 'রূপদর্শিকাই, তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁর স্বরচিত ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মূল্যবান। শেষছত্রে আছে তাঁর আত্মপ্রত্যয়—সধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। এ প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে এমন একজনের কণ্ঠে যিনি দেশ-বিদেশের চিত্রকলায় রূপের রসে বারবার অবগাহন করেছেন কিন্তু ধর্মচ্যুত হন নি। পরন্তু বৃহত্তর বিশ্বের বিচিত্র-চিত্রকলাপ তাঁর পুরাতন ধর্মনিষ্ঠাকেই দৃঢ়তর করেছে। এখানেই অবনীন্দ্র-শিষ্যমণ্ডলী শাশ্বত, এখানেই তাঁরা চিরন্তন।

প্রত্যেক নৈষ্টিক শিল্পীর মত অসিতকুমারও শিল্প-সমালোচকদের পল্লবগ্রাহিতার কথা ভেবে আশঙ্কিত আতঙ্কিত। ব্যর্থকাম সাহিত্যিক শেষপর্যন্ত সাহিত্য-সমালোচকে পরিণত হন বলে যে লোকশ্রুতি আছে সেটি বোধহয় অকারণ নয়। শিল্প-সমালোচকরা ততোধিক মারাত্মক। সাধারণতঃ সংবাদপত্রের একটি কলম, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিগ্রী, একটি স্তাবকচক্র—শিল্পীদের সন্ত্রস্ত করতে যে কোন সমালোচকের হাতে এই আয়ুধত্রয় যথেষ্ট। এতে আর্টডিলারের ভূমিকাও আছে। তাঁর কমিশনের পরিমাণের উপরেই সমালোচনা সর্বাধিক নির্ভরশীল। অসিতকুমার বলেছেন—"এইসব দেশবিদেশের তথাকথিত কলা-রসিকেরা কেহই শিল্পীগোষ্ঠীভুক্ত নন। সুতরাং এঁরা চারুকলার রসবিচার করতে পারেন নি।"

এই বিভ্রান্তি আমাদের দেশেও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবনীন্দ্র শিষ্যমণ্ডলীর প্রায় সকলেই আজ পরলোকে। যাঁরা জীবিত, তাঁরা বয়োভারে ক্লান্ত। ভারতশিল্পের মুখ্য প্রবক্তা সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট আজ জীবন্মৃত প্রতিষ্ঠান। এই নৈরাশ্যের মধ্যে শেষবারের মত স্বনামধন্য শিল্পী নিজ মত ও পথের কথা অসংখ্য যুক্তি ও ততোধিক বলিষ্ঠ হৃদয়াবেগ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত দেশবিদেশের শিল্প বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়েছে। ভারতীয় শিল্পচর্চার ইতিহাসকেও তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসের আলোকে।

শিল্প হল যেকোন জাতির সজীব প্রাণের লক্ষণ—অতএব তা ইতিহাস নিরপেক্ষ হতে পারে না। এমন কি শিল্পী যদি নিছক নিসর্গ-চিত্রী হন তবুও তাঁর বর্ণ বিলেপণে, তুলির বর্ণিকাভঙ্গে, কল্পনার প্রসারে ধরা পড়ে ইতিহাস। সমকালীন সমাজচেতনা সেখানে আসবেই। অসিতকুমার এই তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই গ্রন্থটি সুখপাঠ্য। এমন নয় যে সবক্ষেত্রেই তিনি স্বগোষ্ঠী বহির্ভূত শিল্পীদের প্রতি সুবিচার করেছেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি হয়ে উঠেছেন সেন্টিমেণ্টাল।

ফটোগ্রাফির আবিষ্কারকে অনেকেই চিত্রে শিল্পে আধুনিকতার কারণবলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ যে মডেলকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে ছবি আঁকান হয় তাকে যদি কয়েক সেকেণ্ডে ক্যামেরায় ধরা যায় তবে সেই মডেলের ছবি এঁকে সময়ের অপব্যয় করে লাভ কি? অতএব ফর্ম ভাঙ্গো। এ-হল অতি মামুলী যুক্তি। ফর্ম ভাঙ্গার মূলে ফটোগ্রাফী অন্যতম কারণ, কিন্তু সেটা মুখ্য কারণ নয়। কমার্সিয়াল আর্টিষ্টের কাছে সেটা বিবেচ্য। কারণ আর্টিষ্ট না হয়ে ফটোগ্রাফার হবে কিনা সেটা তাদের ভাবতে হয়েছে। কিন্তু যাঁরা ফাইন আর্টকে মেনে নিয়েছেন, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ রসের সন্ধানে যাঁরা নিরলস সাধনা করে চলেছেন তারা, ফটোগ্রাফীকে কোন চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করেন নি। আসলে শিল্পীর ক্ষমতা-অক্ষমতাই হল ফর্মের পরিবর্তনে প্রধান সহায়ক। সুররিয়ালিজমকে কেউই বলেন নি "প্রকৃতির বাইরের জিনিস"। বরং তাঁরা একে বলেছেন প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ছন্দ—যা সহসা সাদা চোখে দেখা যায় না, হৃদয়গত উপলব্ধির ব্যাপার। আর সকল বাদবিসম্বাদের পরও দেখা যাচ্ছে কিউবিজম (যার উদ্ভব ১৯০৯) আর্ট বলে স্বীকৃত হয়েছে। কোন আর্ট টিকবে আর কোনটি ধোপে টিকবে না সেটা বিচারের অধিকারী ইতিহাস। সমকালীন মানুষ কেবল সমালোচনার অধিকারী।

অসিতকুমার যেখানে সমালোচক সেখানে নিজমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নির্মম। কিন্তু যেখানে তথ্য ও ইতিহাস সেখানে তিনি উদার পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। সারা বিশ্বের শিল্পকলার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসীম দক্ষতার সঙ্গে তিনি বিবৃত করেছেন। কোথাও আলস্য নেই। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা নিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন ইতিহাসের একএকটি পৃষ্ঠা। এর সর্বাধিক মূল্যবান অংশ ভারত ও মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা। যবদ্বীপ, মালয় চম্পা, চীন, ইরাণ ও মিশর নিয়ে তাঁর আলোচনা এ কারণে মূল্যবান যে এর প্রত্যেক আলোচনাকে তিনি বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার নিরিখে বিচার করেছেন।

অসংখ্য মুদ্রণ প্রমাদ এ গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি। প্রচ্ছদ দুর্বোধ্য, কোন সৌন্দর্যের ইঙ্গিত এতে নেই। শিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ-নির্বাচনে প্রকাশক বইটির প্রতি সুবিচার করেন নি।

চণ্ডী লাহিড়ী

এই অন্ধকার-আলো। প্রফুল্লকুমার দত্ত। আধুনিক কবিতা প্রকাশনী। ১, মিডল রোড, কলিকাতা ৩২ ॥ দাম আড়াই টাকা ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্তের 'এই অন্ধকার আলো' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। অর্থাৎ কাব্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান কবি একেবারে 'তরুণতম' বলতে যা বোঝায় তা নয়; প্রায় এগারো-বারো বছর ধ'রে শ্রীদত্তের কাব্যচর্চা অব্যাহত ধারায় চলেছে। এই ভূমিকাটুকু সাম্মনে রেখে গ্রন্থটির আলোচনা করা যেতে পারে, সেইসংগে কবি-মানসেরও।

প্রথমেই বলা ভালো, কবির পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থখানি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি ; তবু যিনি দীর্ঘকাল ধ'রে কাব্যচর্চ্চা করেছেন তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থে পূর্বের রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে উঠবেন, এ অনুমান অসংগত নয়। অন্তত সাধারণভাবে এই সত্যকে মেনে নিয়েই কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। আধুনিক কবিতার প্রসংগে যে গুটিকয় কথা বহুবার উচ্চারিত, তার মধ্যে কিছু সত্য আছে বলেই তার পুনরুল্লেখ এই সূত্রে একেবারে অপ্রাসংগিক হবে না। যেমন কবিতার দুর্বোধ্যতা বা দুরূহতার প্রসংগ। কর্ম-সচেতনতা থেকেই এই দুরূহতার প্রয়োগ-বাহুল্য হলেও কর্মসচেতনতা নিঃসন্দেহে আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ। কারণ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, বলা যায়, 'মনের আনন্দে গান গাইতে যেমন সংগীত হয় না, মনের আবেগে লিখে গেলেও তেমনি কবিতা হয় না।' কবিতা শব্দকায়। শব্দের মধ্য দিয়েই কবির আত্মাকে, তাঁর মানসিকতাকে আমরা কাছে পেতে চাই। আর যেদিন থেকেই ফর্মের এই সচেতনতা লক্ষ্য করা গেল, সেইদিন থেকেই আমরা দেখলাম, কবিরা দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন, অর্থাৎ কবিরা 'আধুনিক' হয়ে উঠবার চেষ্টা করছেন। একথা পুরোনো হলেও সত্য যে, আধুনিক কবিতা পাঠ করি আমরা 'আধুনিক' বলে নয়, কবিতা বলেই। অন্যথায় 'আধুনিকতা' কথাটি তাৎপর্যশূন্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু এও বাহ্য। কারণ আমার বক্তব্য, একেবারে সাম্প্রতিককালের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে, একধরণের প্রয়োগ যা দুর্বোধ বা দুরূহ নয়—তাকে বলা যাবে প্রকাশের অস্বচ্ছতা। অর্থাৎ কবিদের মনে কিছু ভাব ঘনিয়ে ওঠে, তা থেকে প্রাক্-সৃষ্টির মুহূর্তের যন্ত্রণা দেখা দেয়, এবং সৃষ্টির পরে দেখা যায় যা হল তা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহও নয়, তা বিকলাংগ। এই জাতীয় কবিতার প্রকাশ হাল আমলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কল্যাণে দৃষ্টিগোচর হবে। বলা বাহুল্য শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্তের গ্রন্থের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা সেইদিক থেকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত।

'এই অন্ধকার আলো' গ্রন্থের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা উচ্চমানের সৃষ্টি বলে আমার মনে হয়েছে। এই গ্রন্থের অনেক পংক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য। 'আত্মকথা' কবিতাটি কবি-মনের যন্ত্রণা 'সম্রাটের সমারোহ নিয়ে বেঁচে থাকার' ইচ্ছের প্রকাশে বিধৃত এবং আলোচ্য গ্রন্থের একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট কবিতা। এই পংক্তি কটি পড়ুন :

> 'আমিও নিঃশেষ প্রতিপন্ন কি ? অথচ ভুলিনি তো
> অমৃতের পুত্র আমি নিষ্কম্প প্রদীপ শিখা হাতে ;
> বাউলের মত আজো যে সংগীত আত্মভোলা প্রীত
> তার প্রেমে, সাড়া দেব প্রত্যাসন্ন অন্ধকার রাতে।'

এই রকম ভালো পংক্তি এই বইয়ে অজস্র আছে যা কবিতার শ্রেয়োচিন্তার দিকটি প্রকাশ করবে। 'এই অন্ধকার আলো' 'অমৃত' 'বাঁচার মহৎ পথে' 'ব্রহ্মাণ্ডবিহারী' 'ভাবানুসংগ' 'শিল্পীর বিবেকে' এই গ্রন্থের ভালো কবিতা 'বাঁচার মহৎ পথে প্রতি পদক্ষেপে নাজেহাল' কবির সূর্যমুখী চেতনা আজো জাগরূক,—এমন আশার কথা বিশ্বাসের কথা হাল আমলের 'ছিটগ্রস্ত' (কিংবা বীট-গ্রস্ত) কবিদের রচনায় বড় একটা শোনা যায় না। জীবন যে কী এবং এই প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখবার তাৎপর্যই বা কোন্‌খানে এই চিন্তায় আজ সমস্ত কবিই অজস্র কালক্ষেপ করছেন। এবং

সমালোচ্য কবিও আহার নিদ্রা মৈথুন নারী ইত্যাদি প্রসংগও এড়িয়ে যাননি কিংবা এড়িয়ে যেতে চাননি. 'যুগ যন্ত্রণা'র কবলে তিনিও ভারাক্রান্ত, তবু প্রকাশের অনবদ্য ভংগীর জন্য তা কেবল যৌন-চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি,—এটুকু বড় কম কথা নয়।

সেদিক থেকে বলতে দ্বিধা নেই, হাল আমলে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি নিজগুণে বিশিষ্ট স্থান করে নেবে। তথাপি, পূর্বে যা বলেছি সেই সূত্র ধ'রে বর্তমানকালের একজন কাব্য-পাঠক হিসেবে কবি শ্রীদত্তকে একটু সতর্ক ক'রে দিতে চাই। যেমন ধরুন, 'প্রসব-লগ্নে' কবিতায় 'প্রজনন ক্ষমতা' শব্দটি প্রজননের অর্থব্যঞ্জনা আনে না ; মানুষেরা পুরুষানুক্রমে মানুষের মাংসলালসায় মানুষকে বিপথে চালায় (রেলপথ) তিনটি শিশু ওই দেখ ওদিকে ফুটপাতে ধূলায় কাঁদে' (তিনটি শিশুর মা ও চতুর্থ যুবক) 'আমার সংসারে কৃচ্ছ্র সাধনের ব্রত, স্ত্রীর হাতের যা কিছু সম্বল তুলে দিচ্ছি, প্রতিরক্ষার্থে,((না, না আমরা যুদ্ধ চাইনি) 'দ্যাখো, কী সুন্দর চাঁদ ! 'স্ত্রী বলছে, হ্যাঁ বুঝেছি, এ দেহটা এক্ষুণি চাইছো' (জীবন-বৃত্ত) ইত্যাদি পংক্তি আমার কাছে খুব বেশি আবেদন আনে না। এই পংক্তিগুলি দুর্বোধ নয়, দুরূহও নয়, কেবল পড়তে গেলে মনে হয় কবি যেন জোর করে নিজেকে 'আধুনিক' প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয়, তাঁর একই গ্রন্থের অন্তর্গত পূর্বোক্ত কিছু উচ্চমানের কবিতার পাশে এই জাতীয় পংক্তি ও কবিতা কবি-মনের খানিকটা স্ববিরোধ প্রতিপন্ন করছে।

কাব্যগ্রন্থে বানান ভুল অমার্জনীয় অপরাধ, বলে আমার মনে হয়। অন্যান্য ভুল ছেড়ে দিলেও 'বাল্মীকি' বানানটি একাধিকবার 'বাল্মিকী' আকারে চোখে পড়ল। পরবর্তী সংস্করণে কবি এবিষয়ে সচেতন হবেন, আশা রাখব।

আর একটা কথা। গ্রন্থের আগে যে প্রকাশিকার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তার কোনো একজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। কারণ প্রতি কবিতার নিচে যখন তারিখ দেওয়া আছে তখন আর কোনো তথ্য জানবার পাঠকের কৌতূহল নেই।

এই সমস্ত সত্ত্বেও আবার বলব, 'এই অন্ধকার আলো' সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থের আসরে বিশিষ্ট কাব্যসংযোজন। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ সুন্দর।

রেবন্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রথম ভালোবাসা ॥ তির্যক কাব্য সংকলন ॥ সরিৎশেখর মজুমদার (মুদ্গল মুনি) ॥ গ্রন্থজগৎ ॥ কলিকাতা। দাম দু'টাকা ॥

লেখক অঙ্কিত মলাটের কোন থেকে যে বাঁকা তীরটি 'প্রথম ভালোবাসা'র হৃদয় ছুঁই ছুঁই করছে, বইটির প্রতীক হিসেবে তা চমৎকার। তির্যক দৃষ্টিতে যেন দেখা হচ্ছে ভালাবাসাকে, তথা জীবনের

সব কিছুকে। প্রথম কবিতার নামে গ্রন্থের নামকরণ, কিন্তু জীবনের যা-কিছু অসঙ্গতি তারই ওপর কটাক্ষপাত আছে।

সামাজিক গ্লানি আর নৈতিক অন্ধকার দেশের আকাশ কালো করে রেখেছে। ঐ দুর্নীতির আবহাওয়ায় বেশ ভালোভাবে গজিয়ে ওঠে ব্যঙ্গকবিতা, যেমন হয়ে'ছিল অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে। ড্রাইডেন আর পোপের কাব্যে, কন্‌গ্রিভ আর ওয়াইচারলির নাটকে, এডিসন সুইফ্‌ট এর গদ্যরচনায় তাই তখন ব্যঙ্গ আর শ্লেষ, তির্যক কটাক্ষপাত। তেমনি আমাদের বর্তমান যুগে। আজ যেদিকে তাকানো যায়, পাওয়া যায় কিছু তির্যক কাব্যের খোরাক। সরিৎশেখরও তাই পেয়েছেন। সিনেমা, ফুটবল, ষ্টেটবাস, বস্ত্রহরণ থেকে অফিসগামিনী বধূ, আমাদের সমাজের সব দিকের সব কিছু অসঙ্গতি তাঁর বাঁকা চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, সহজ সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি প্রত্যেকটি অসঙ্গতির রূপ ও প্রকৃতি প্রকাশ করেছেন। একটার পর একটা উদ্ধৃতি দিতে ইচ্ছে করে এই প্রসঙ্গে, এমনই সার্থক ধারালো তাঁর ব্যঙ্গের ছুরি। শেষ কবিতা 'তথাস্তু'তে কবি বলেছেন :

ব্যঙ্গরসিক, ওগো ভগবান!
কি তীক্ষ্ণ তব তির্যক বাণ!
রক্ত-ঝরানো রসিকতা, তবু
বলি হেসে : তথা অস্তু!

দেহটার সঙ্গে 'মন' নামে এক বস্তু জুড়ে দিয়ে ভগবান যে কি তীব্র রক্ত-ঝরানো রসিকতা করেছেন তা কবি যতীন্দ্রনাথের ঢং-এ প্রকাশ করে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

কতকগুলি 'কণিকা'র মতো ছোট কিন্তু ভাবের তীব্রতায় ও অলংকারের রমণীয়তায় ভাস্বর রচনাও স্থান পেয়েছে। যেমন : 'গরীব', 'গান্ধীবাদ', 'মানদণ্ড'। এ-ধরণের কবিতা শোনায় লিমারিকের মতো। এপিগ্রামের সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে এখানে যোগ হয়েছে কারুশিল্প, ঠিক ভাবের অপূর্ব বাহন হিসেবে। সংক্ষেপে বলি, সরিৎশেখরের ব্যঙ্গকবিতাগুলি পড়ে হাসি-কান্না আসে না, এগুলি গভীর ভাবের সৃষ্টি করে। এগুলি কাব্য। এ-হেন প্রচেষ্টা সাধুবাদের যোগ্য। গ্রন্থের আগামী সংস্করণে এই লঘুপাক গুরু দ্রব্য আরো বেশী পরিমাণে পাঠক-সমাজে পরিবেশিত হলে জাতীয় স্বাস্থ্যের অন্ততঃ সামান্য পরিমাণ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়